ইতিহাস
পরিচয়
(মধ্যযুগ)

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education
T. B. No. VII/H/81/82 Dated 8.1.81

ইতিহাস পরিচয়

[মধ্যযুগ]

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম. এ. (ডবল), বি. টি.
ডব্লু. বি. এস. ই. এস.
প্রধান শিক্ষক
হিন্দু স্কুল, কলিকাতা

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
হেয়ার স্কুল, কলিকাতা, বারাসাত গভঃ হাই স্কুল, জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল, চুচুড়া ডাফ্ হাই স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম (হায়ার সেকেণ্ডারি মালটি পারপাস স্কুল) রহড়া, শান্তিপুর ওরিয়েণ্টাল একাডেমি, বুরুল হাই স্কুল।

ও

শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, এম. এ., বি. টি.
সহ শিক্ষক
মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয় (উচ্চতর মাধ্যমিক)

জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৮৫

দাম—দশ টাকা

মুদ্রাকর
ত্রিনয়নী প্রিণ্টার্স
৬৯/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায়

সময়ের হিসাবে মধ্যযুগের ইতিহাস বলতে প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে বোঝায়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগের শুরু, এবং ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের মধ্য দিয়ে এই যুগের সমাপ্তি। পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্থায়ী এই যুগেই প্রাচীন মিশর, ভারত, গ্রীস এবং রোমের সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ ও এশিয়ার বুকে দেখা দিয়েছিল এক নতুন সভ্যতা।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠল নতুন রাষ্ট্র, নতুন সমাজ এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন ঘটল। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠেছিল বলেই ইউরোপের নতুন সমাজ এবং রাষ্ট্রকাঠামোর ওপর রোমান আইন এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রভাব থেকে গেল। জার্মান জাতি রোমের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সামাজিক প্রথা গ্রহণ করল। চার্চ লেখাপড়ার মাধ্যম হিসাবে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করতে লাগল। বস্তুত, মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় রোমান সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্যই থেকে গেল।

শক্তিশালী এবং হিংস্র বারবেরিয়ান বা জার্মান দলের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি এদের কোনই আগ্রহ ছিল না। এমনকি মানুষকে হত্যা করতে বা গ্রন্থাগার ধ্বংস করতেও এরা দ্বিধা করত না। তাই এরা আক্রমণ করলেই মানুষ তাদের মূল্যবান বইপত্র নিয়ে আশ্রয় নিত চার্চে। এভাবেই আস্তে আস্তে চার্চ হয়ে উঠল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

সামন্ত প্রথার উদ্ভব এই সময়েই হয়েছে। অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে এক নতুন শক্তিশালী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল, এরাই লর্ড বা সামন্ত নামে পরিচিত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরেই ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই কিন্তু মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি পঞ্চম শতাব্দী থেকেই দেখা যায়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত বলেই ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। নবম শতাব্দীতে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে অনেকগুলি রাজপুত রাজ্য গড়ে ওঠে। এরাও পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। রাজনৈতিক ঐক্য না থাকায় কেন্দ্রীয় শক্তি গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি, আর তাই বিদেশীরা সহজেই ভারত আক্রমণ করতে পেরেছে।

দক্ষিণ ভারতেও একই চিত্র দেখা যায়। চোল সাম্রাজ্য এর মধ্যে কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চোল সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজপুতদের অধীনে ভারতে এক বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে ইউরোপের সামন্ত ব্যবস্থার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের নাইটদের মত রাজপুত অভিজাত সম্প্রদায় যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

ভারতে জাতিভেদ প্রথা এই সময় প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখা যায়। নিম্নবর্ণের মানুষেরা অত্যাচারিত হতে থাকে। প্রাচীনকালে বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতের ভাবের আদান প্রদান ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গজনীর সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের সময় বিখ্যাত পণ্ডিত আলবেরুনী ভারতে এসেছিলেন। তিনি সেই সময় ভারতবাসীর সঙ্কীর্ণচিত্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয়দের উদারতার কথাও তিনি বলেছেন।

মোটামুটিভাবে দেখা যায় ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে মধ্যযুগ

প্রায় একই সময়ে শুরু হয়েছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের সময়সীমা ছিল পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশে মধ্যযুগের আরম্ভ বা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় বলা কঠিন। কারণ পৃথিবীর সব জায়গাতেই মধ্যযুগ একই সময়ে শুরু হয়নি। আস্তে আস্তে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই প্রাচীন যুগের ধাপগুলো মধ্যযুগে একীভূত হয়ে যায়। ইতিহাসের বিশাল পরিধিকে বোঝাবার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়কেই তাঁরা মধ্যযুগের সূচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তোমাদের মনে রাখা দরকার যে মধ্যযুগের মানুষেরা কিন্তু তাদের যুগকে মধ্যযুগ বলে মনে করত না, তারা তাদের যুগকে বর্তমান যুগ বলেই ভাবত। পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে একটা বিশেষ সময়কে মধ্যযুগ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। হয়ত আজ থেকে এক হাজার বছর পরে আমাদের যুগকেই ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করবেন।

আরব দেশে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল সপ্তম শতকে। ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আরবদেশে এক নতুন সভ্যতার জন্ম হয়। সেই সভ্যতা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইউরোপ এক নতুন জ্ঞান ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগের সমাপ্তি পঞ্চদশ শতকেই ঘটে, কিন্তু প্রাচ্যে মধ্যযুগের অবসান হয় আরও অনেক পরে।

মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় শহরের সৃষ্টি হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও উদ্ভব এই সময়েই ঘটেছে। প্রাচ্যের প্রভাবে গণিতশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন নতুন করে শুরু হয়। মধ্যযুগীয় অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি জয় করার মধ্য দিয়েই মানুষ ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে ইউরোপ

জার্মান উপজাতিঃ মধ্যযুগে ইউরোপে জার্মান উপজাতিগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই উপজাতিগুলির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলত। ফলে একটি উপজাতি আর একটি উপজাতির হাতে মাঝে মাঝেই পরাজিত ও বিতাড়িত হত। উপজাতিগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্যের অভাব দেখা দেয় এবং জমির অকুলান ঘটে। আর তাই শক্তিশালী উপজাতিগুলি দুর্বলদের বসতি থেকে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করে। খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে জার্মানরা রোম সাম্রাজ্যের শস্যপূর্ণ মাঠ এবং সমৃদ্ধ শহরগুলি লুঠ করার জন্য স্বদেশ ছেড়ে অগ্রসর হল। জার্মান উপজাতিগুলির মধ্যে ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, অষ্ট্রোগথ আর ভিসিগথরাই ছিল প্রধান।

হূণজাতিঃ এই সময় ইউরোপে আর একটি নতুন জাতির আবির্ভাব হল। মোঙ্গল জাতির এই শাখাটি ইতিহাসে হূণ বা হান নামে পরিচিত। হূণদের আদি নিবাস ছিল মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে। তারা দেখতে ছিল খুবই কুৎসিত। তাদের নাক ছিল চ্যাপ্টা আর তাদের গায়ের রং ছিল হলদে। মিটমিটে ক্ষুদে চোখের সঙ্গে সারা গালে ছিল কাটা দাগ আর মাথার চুল ছিল খাড়া খাড়া। স্বভাবে যাযাবর এই জাতি কিন্তু ছিল খুবই পরিশ্রমী।

হূণরা ছিল সত্যি সত্যিই বর্বর। এদের নৃশংতার কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। এদের কোন ঘরবাড়ী ছিল না আর এরা চাষবাসও করতে জানত না। ঘোড়াই ছিল এদের জীবনের প্রধান সহচর। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা এক দেশ থেকে আর এক দেশে চষে বেড়াত, আর এভাবেই তারা দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত। তিন বছর বয়সেই হূণ শিশুকে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেওয়া হত। তারা সব সময় দলবদ্ধ হয়ে চলত এবং যে স্থান দিয়ে তারা যেত সেই স্থানেই তারা লুঠপাট করত। নরহত্যা যেন ছিল তাদের পুতুল খেলা।

আগুন লাগিয়ে গ্রাম, নগর ধ্বংস করা ছিল তাদের কাছে আনন্দ উৎসব। শত্রুর স্ত্রী-পুত্রকে পদতলে পিষে হত্যা করে তারা উল্লাস বোধ
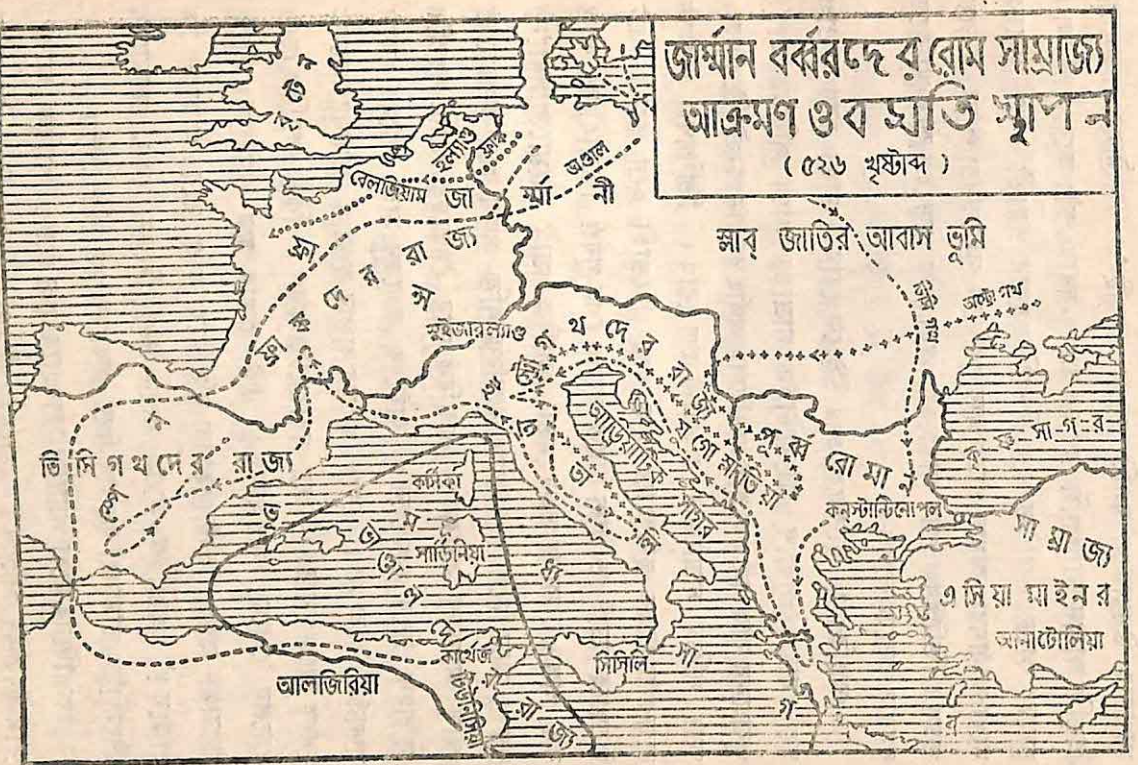
করত। এদের মত দক্ষ তীরন্দাজ সেকালে আর কোন জাতির মধ্যে ছিল না।

হূণ আক্রমণঃ হূণরা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে চীনের পশ্চিম অংশে এবং কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। অষ্ট্রোগথ, ভিসিগথ প্রভৃতি জার্মান জাতিগুলি হূণদের বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। হূণদের কাছে পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হবার পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে জার্মানরা রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে বুলগেরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। ভিসিগথরা রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে বেশ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

এলারিকঃ ইতিমধ্যে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্বাংশ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হল। পূর্বাংশের রাজধানী হল বাইজানসিয়াম অর্থাৎ বর্তমান কনস্টান্টিনোপল। আর পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হল রোম। ভিসিগথরা রোমান রাজকর্মচারীদের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহে সম্রাট ভালেন্স নিহত হলেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের শান্ত করা গেল। তাদের তরুণ নেতা এলারিক সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের বশ্যতা মেনে নিলেন। এরপর এলারিক শক্তি সঞ্চয় করে অপরাজেয় রোম আক্রমণ করলেন। এলারিক তাঁর সৈন্যদের নিয়ে শহরটির চারিদিক ঘিরে ফেললেন। বাইরের জগতের সঙ্গে রোমের কোন সম্পর্কই রইল না। শেষে খাদ্যের অভাব হওয়ায় রোমানরা অনেক ধনরত্ন দিয়ে গথদের ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু এলারিক চেয়ে বসলেন রোমের সমস্ত ধনরত্ন। এই প্রস্তাব শুনে রোমানরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'সবই তোমরা যদি নিয়ে যাও, তবে আমাদের কি থাকবে?' এলারিক অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, 'কেন, তোমাদের জীবন!' রোমানরা বহু অর্থ দিয়ে সেবারের মত মুক্তি পেল।

কিছুদিনের মধ্যে সম্রাটের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে এলারিক আবার রোম আক্রমণ করলেন। রোমের ক্রীতদাসরা খুলে দিল রাজধানীর দরজা। তিনদিন তিনরাত্রি ধরে গথরা রোম লুঠ করল। এলারিক বারবেরিয়ান হলেও খ্রীষ্টান গীর্জা বা গীর্জার সম্পত্তি লুঠ করেন নি।

রোম সাম্রাজ্যের পতন : প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই বিস্তৃত ছিল। এই শক্তিশালী সুবিশাল সাম্রাজ্যের যে পতন হতে পারে, তা রোমানরা কখনও ভাবেনি। কিন্তু তবু রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বিশাল রোমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতার অধঃপতন আরম্ভ হয়। রোমের শাসকসম্প্রদায় এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ছিলেন বিলাসী, অকর্মণ্য ও অমিতব্যয়ী। সৈন্যদল হয়ে উঠেছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল। রাজসভার জাঁকজমক এবং অভিজাত শ্রেণীর বিলাসিতার ব্যয়ভার কিন্তু জনসাধারণকেই বহন করতে হত। ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকায় রোমানরা কর্মবিমুখ, অলস ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আর তাই সাম্রাজ্যের ভিত নানাদিক থেকেই শিথিল হয়ে পড়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় কতগুলি হিংস্র ও পরাক্রান্ত বারবেরিয়ান বা জার্মান দল এসে রোমে উপস্থিত হল এবং রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করল। এরপর মধ্য এশিয়ার হিংস্রতর হূণ জাতি রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। জার্মান ও হূণ এই দুই জাতির আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এটিলা : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের প্রায় সমস্ত অংশই জার্মানরা দখল করেছিল। হূণদের হঠাৎ আক্রমণে জার্মান ও রোমান উভয় জাতিরই খুব বিপদ উপস্থিত হল। হূণ নায়ক এটিলা পূর্ব-এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর থেকে ইউরোপের রাইন নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলেন। এটিলা রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করলেন। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটকে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করে আত্মরক্ষা করতে হল। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এটিলা গল আক্রমণ করেন। এটিলা গর্ব করে বলতেন, 'যেখানে আমার অশ্ব পদক্ষেপ করেছে, সেখানে আর কখন ঘাস জন্মাতে পারবে না।' এই দুঃসময়ে ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ এবং রোমানরা নিজেদের

বিবাদ ভুলে গিয়ে একসঙ্গে এটিলার বিরুদ্ধে ট্রয়েসের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হল। উভয়পক্ষে লোক নিহত হল প্রায় দেড়লক্ষ, কিন্তু এটিলা জয়লাভ
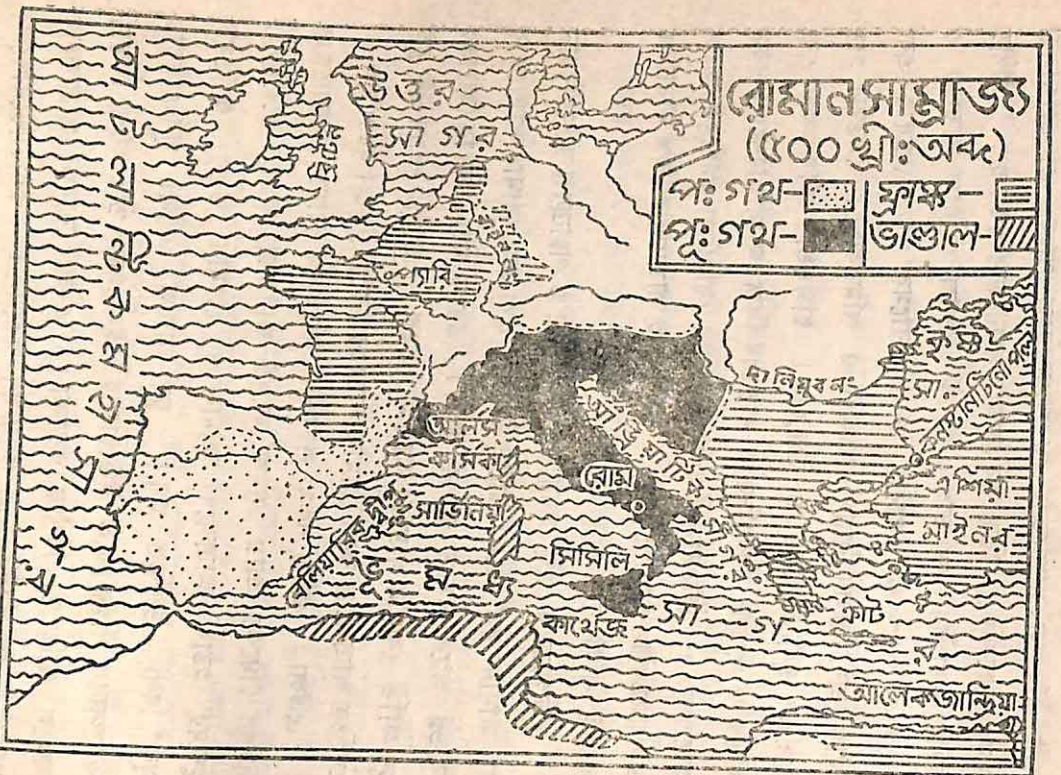
করতে পারলেন না। এটিলা জয়লাভ করলে ইউরোপে হূণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হত।

এরপর এটিলা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। পোপ লিও-র অনুরোধে এটিলা রোমান সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করলেন। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে

এটিলার মৃত্যু হয়। ইতিহাসে এটিলা 'ঈশ্বরের অভিশাপ' নামে কুখ্যাত। এটিলার মৃত্যুতে ইউরোপ যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেল।

এটিলা রোম আক্রমণ করছেন

গ্যাসেরিক ঃ ভ্যাণ্ডালরা প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্পেনে প্রায় তেইশ বছর (৪০৬—৪২৯ খৃঃ) বসবাস করেছিল। এরপর

তারা আফ্রিকায় চলে আসে। তারাও ছিল হূণদের মত ধ্বংসবিলাসী। আগুন লাগান, লুঠ করা বা হত্যা করা ছিল ভ্যাণ্ডালদের কাছে অতি সাধারণ কাজ। তারা শুধু ধ্বংস করত বলে ভ্যাণ্ডাল বা ধ্বংসকারী জাতি নামে পরিচিত। এদের বিখ্যাত রাজা ছিলেন গ্যাসেরিক। তিনি উত্তর আফ্রিকায় এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর যুদ্ধ-জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে লুঠ করে বেড়াত। বস্তুত, গ্যাসেরিকের সৈন্যবাহিনী কুখ্যাত হয়ে পড়েছিল ধ্বংস ও লুঠ করার জন্য। গ্যাসেরিকের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ে এবং মানুষও ভ্যাণ্ডালদের আতঙ্ক থেকে মুক্তি লাভ করে।

বর্বরদের আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। বিলুপ্ত হল রোমান সভ্যতা এবং বিনষ্ট হল ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্য। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের আইনকানুন কিছু কিছু বর্বর জাতিগুলি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যেও প্রচলিত হল।

বর্বর আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি রোমান সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ফ্রাঙ্করা জয় করে নিল ফ্রান্স, ভিসিগথরা স্পেন, ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকা, অষ্ট্রোগথরা সমস্ত ইটালী। বারবেরিয়ানদের এংগেল, স্যাক্সন ও জুট শাখা ইংলণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করল।

যুদ্ধ করাই ছিল বর্বরদের নেশা। লেখাপড়া, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। লেখাপড়ার চর্চা বন্ধ হওয়ায় সাধারণ লোকের মন ভয় ও কুসংস্কারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

জার্মান নারীরাও ছিল পুরুষদের মত সাহসী। প্রয়োজনে তারা যুদ্ধে পুরুষদের সাহায্য করত। জার্মানদের যুদ্ধের দেবতা ছিলেন ওডেন, থর প্রভৃতি। ওডেন দেবতার নাম থেকে ওয়েডনেস-ডে, থর দেবতার নাম থেকে থার্স-ডে প্রভৃতি দিনের নামকরণ হয়েছে। অতিথি-পরায়ণ এবং প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপর জার্মানদের পারিবারিক জীবন ছিল পবিত্র। জার্মানরা রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর তাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়
অন্ধকার যুগ

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের শুরু থেকেই ইউরোপে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সূচনা হয়। বর্বরদের আক্রমণের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি যখন প্রায় লুপ্ত হল, ব্যবসা-বাণিজ্য যখন হতে চলল নষ্ট, তখনই ইউরোপের বুকে নেমে এল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের এক কালো ছায়া। চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক অন্ধকার যুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

এই সময়কার ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব অস্পষ্ট। বস্তুত, এই যুগ থেকে প্রাচীন যুগের ঘটনাবলীও আমরা বেশী জানতে পেরেছি। এই যুগ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট বলেই অনেকে এই সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলেছেন।

কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিকরা এই যুগকে আর অন্ধকার যুগ আখ্যা দিতে রাজী নন। পূর্বে ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে এই যুগ আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক এবং কৃষ্টির দিক থেকে গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু পণ্ডিতরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই যুগ এমন কিছু প্রতিভা ও নতুন কৃষ্টি সৃষ্টি করেছে যা মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে। পণ্ডিতরা মনে করেন মধ্যযুগ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলেই আমাদের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা এমন কি ধর্মচিন্তারও উৎস ছিল তথাকথিত অন্ধকার যুগ। বিভিন্ন দেশের জাতীয় ভাষার প্রাথমিক সূত্রপাতও এই মধ্যযুগে হয়েছে। এই ভাষাগুলির সৃষ্টি হয় গল্প, উপদেশ, স্তোত্র, কবিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়েই।

এই যুগে গীর্জাগুলি ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। গীর্জাসংলগ্ন মঠগুলিতে জ্ঞানের চর্চা চলত। মধ্যযুগের প্রথম দিকে গীর্জাগুলিই ছিল সভ্যতাকে ধরে রাখার একমাত্র মাধ্যম। এই সময় অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তিই ছিলেন গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি সব কিছুরই অনুশীলন গীর্জার মাধ্যমে চলত। পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীরাই অশিক্ষিত বারবেরিয়ানদের শিক্ষা দেবার প্রয়াস চালাতেন। গীর্জা মানুষের জীবন যাপনের নৈতিক মান ঠিক করে দিয়েছিল এবং

এগুলি না মেনে চললে শাস্তি দেবার ব্যবস্থাও করেছিল গীর্জাই। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক উপায়েই শাস্তি দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

ন্যায়-অন্যায় বোধ গীর্জাই মানুষের মধ্যে জাগরিত করেছিল। মানুষের নৈতিক বোধকে উন্নত রাখার দায়িত্বও ছিল গীর্জার। গীর্জাই ছিল অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছিল চার্চগুলি। সুতরাং চার্চগুলির ভূমিকা মধ্যযুগে ছিল উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, চার্চ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে যদি মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা না চলত তা হলে পঞ্চদশ শতকে নবজাগরণ ঘটত কিনা সন্দেহ।

মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন যাজক সম্প্রদায়। মঠে মঠে ছিল বড় পাঠাগার আর বিদ্যালয়। বিদ্যাচর্চা করে, স্থানীয় শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে, পাণ্ডুলিপি লিখে ও নকল করে, নিয়মিত প্রার্থনা ও অন্যান্য নানা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও নিয়ম পালন করেই মঠবাসী সন্ন্যাসীদের দিন কাটত। তাঁদের জন্যই চারদিকে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও কুসংস্কারের মধ্যেও বিদ্যাচর্চা লুপ্ত হয়ে যায় নি। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অব্যাহতভাবে চলে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে।

যাজকদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল একদল পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। অন্ধভাবে কোন কিছু মেনে না নিয়ে তাঁরা যুক্তি দিয়ে সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করতেন। এইভাবেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল।

এই যুগে কতগুলি মঠ ও বড় বড় গীর্জা বিদ্যাচর্চার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। বহু ছাত্র সে সব জায়গায় গিয়ে শিক্ষালাভ করত। এইসব শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

এইসব আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে মধ্যযুগ মোটেই পুরোপুরি অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নিয়মিত ভাবেই চলত। বহু প্রতিভার জন্মও এই সময়ে হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজাণ্টাইন সভ্যতা

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রায় একশ বছর আগে এই ভাগ হয়ে যাবার বীজ প্রথমে বপন করেন সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান। পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম এবং পূর্বভাগের রাজধানী ছিল বাইজানটিয়াম অর্থাৎ বর্তমান কনস্টান্টিনোপল্। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য প্রায় হাজার বছর (অর্থাৎ ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ খ্রীঃ) টিকে ছিল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি দেশ নিয়ে ইউরোপ, এশিয়া ও অফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত ছিল। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টাণ্টাইন প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজানটিয়ামে নিজের নামে নতুন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেন। এই কনস্টান্টিনোপলই বর্তমানে তুর্কীদেশের ইস্তাম্বুল শহর। পূর্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ধর্মের লোক বাস করত। তাদের মধ্যে একমাত্র একই সম্রাটের শাসনাধীনে থাকা ছাড়া অন্য কোন মিল ছিল না। সম্রাট কনস্টাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্মকে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধর্ম বলে ঘোষণা করেন। রাজধানী কনস্টান্টিনোপল ছিল দুর্ভেদ্য এবং শত্রুর অগম্য। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল কঠোর। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ছিল দেখবার মত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমাঞ্চলে কতকগুলি অঞ্চলে বাইজাণ্টাইন সম্রাটের প্রভুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়া ও মিশরের শাসনব্যবস্থাও প্রায় আলাদা হয়ে গেল। সপ্তম শতাব্দীর পর বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের যে অংশ অবশিষ্ট রইল তার অধিবাসীরা ছিল গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় অনুপ্রাণিত। এই সময় বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যকে গ্রাক সাম্রাজ্য বলা হত। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের

আয়তন আরও ক্ষুদ্র হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র রাজধানী কনস্টান্টিনোপল এবং এর পার্শ্ববর্তী সামান্য কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সাম্রাজ্য নামটি রয়ে গেল। মুসলমান তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য জয় করে এখানে ইসলামের আধিপত্য স্থাপন করেন। অনেকের মতে এই দিন থেকে নতুন ইউরোপের শুরু।

জাস্টিনিয়ান: (৫১৪—৫৬৫ খ্রীঃ) পূর্ব রোমের সম্রাট জাসটিন তাঁর এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র উপ্রাভিডাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে তিনি ভালভাবে শিক্ষা দিয়ে উপযুক্তরূপে গড়ে তুলেছিলেন। এমন কি রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় নিজের সঙ্গে রেখে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি যোগ্য শাসক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। এই উপ্রাভিডাই ইতিহাসে জাস্টিনিয়ান নামে পরিচিত।

জাস্টিনিয়ান

বর্বরদের আক্রমণের সময় থেকে বহু সম্রাটই এখানে রাজত্ব করেছেন। তাঁদের মধ্যে জাস্টিনিয়ান ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের অসাধারণ প্রতিভা ছিল। রাজকার্য ছাড়া শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্ম বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অক্লান্ত কর্মী। তাঁর মহিষী থিয়োডোরা ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহকর্মিণী। রোমের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই ছিল জাস্টিনিয়ানের জীবনের ব্রত। তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সমস্ত দিন তো তিনি পরিশ্রম করতেনই, এমন কি রাত্রিতেও তিনি কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন না। শোনা যায় যে শেষ জীবনে তাঁর ঘুমোবার দরকার হত না। একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটা কল্পনাও করা যায় না। সাধারণ মানুষ তাঁকে দানব মনে করত। কারণ, তখনকার দিনে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে দানবের ঘুম নেই।

জাস্টিনিয়ানের রাজ্য জয়ঃ রোমের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে সহায়ক হিসাবে জাস্টিনিয়ান পেয়েছিলেন মধ্যযুগের বিখ্যাত
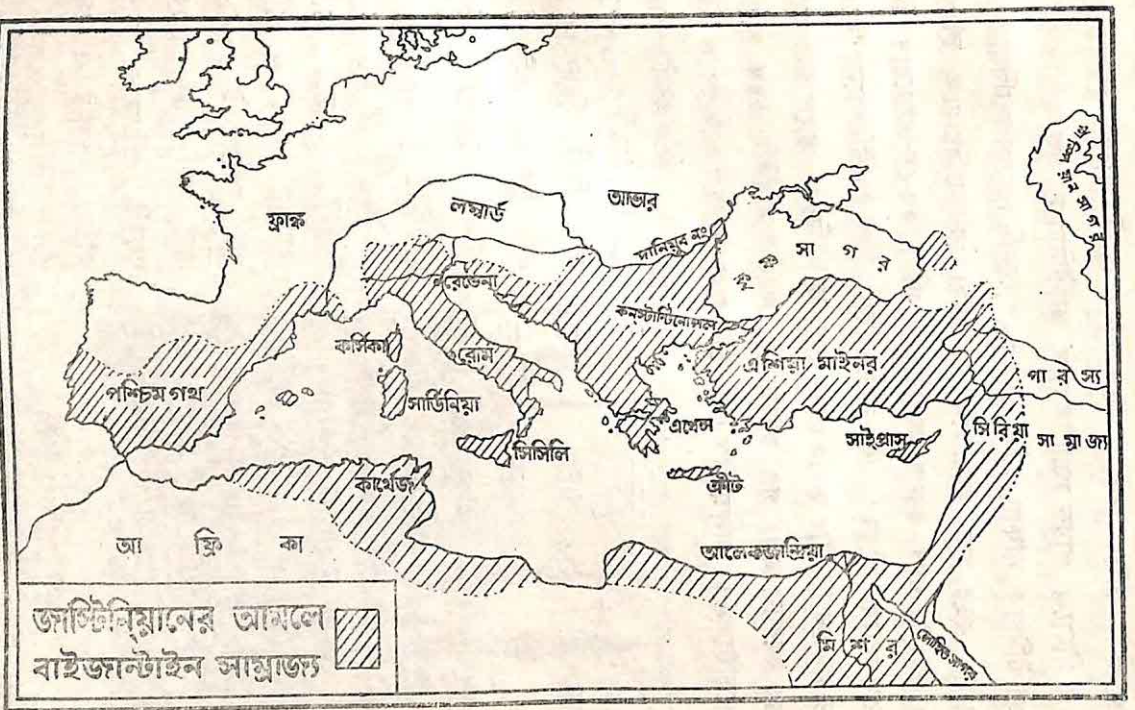
সেনাপতি বেলিসারিয়াসকে। সম্রাট হিসাবে জাস্টিনয়ানের উদ্দেশ্য ছিল বারবেরিয়ানদের অধিকার থেকে রোমান সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশ-

গুলি পুনরায় উদ্ধার করা। বেলিসারিয়াস আফ্রিকা থেকে ভ্যাণ্ডালদের বিতাড়িত করেন ও গথদের হাত থেকে ইটালীর কিছু অংশ উদ্ধার করেন। দক্ষিণ স্পেনের কিছু অংশও জাস্টিনিয়ানের হস্তগত হল। পূর্ব সীমান্তে পারস্য সম্রাটের সঙ্গে জাস্টিনিয়ানের যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু জাস্টিনিয়ান সাফল্য লাভ করতে পারেননি। বেলিসারিয়াস দীর্ঘ বাইশ বছর যুদ্ধ করেছিলেন। গথরা বেলিসারিয়াসকে ইটালীর রাজমুকুট গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিল কিন্তু সে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এত করেও তিনি কিন্তু জাস্টিনিয়ানের বিরাগ-ভাজন হন। তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য জাস্টিনিয়ান তাঁকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছিলেন। গল্প আছে যে শেষজীবনে তিনি চরম দুর্দশায় পড়েছিলেন। অসম্মানিত তো তিনি হলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি চোখ ও একটি পা-ও হারাতে হয়েছিল। শোনা যায়, তিনি ভিখারীর মত এক টুকরো রুটির জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন।

সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা

জাস্টিনিয়ানের সংস্কারঃ সম্রাট জাস্টি-নিয়ানের গৌরব ও কৃতিত্ব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধি-কারী। পথঘাট ও সেতু নির্মাণ, জলাশয় খনন ও সংস্কার, উন্নত কৃষির ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর সময়ে দু'জন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক চীন থেকে গুটিপোকার ডিম নিয়ে আসেন। বিদেশে গুটিপোকার চালান

তখন চীনে নিষিদ্ধ ছিল। জাস্টিনিয়ান এই গুটিপোকার ডিম ফুটিয়ে রেশম তৈরী করালেন। এভাবেই রেশম শিল্পের ওপর চীনের একাধিপত্য নষ্ট হয়ে গেল। তিনি সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য অনেক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করিয়েছিলেন। বহু মনোরম অট্টালিকা, মঠ ও গীর্জাও তিনি তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল সেন্ট সোফিয়া গীর্জা। এর নির্মাণ কৌশল, কারুকার্য ও জাঁকজমক মানুষকে বিস্মিত করে। জাস্টিনিয়ান চিত্রশিল্পেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

জাস্টিনিয়ানের আইন ঃ জাস্টিনিয়ানের আর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রোমের নতুন আইন প্রণয়ন। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা ও আইন প্রচলিত ছিল। তিনি সেই রীতিনীতি ও ব্যবস্থাগুলি বিধিবদ্ধ করে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য প্রচলন করলেন। এই বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি জাস্টিনিয়ানের আইন নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। জাস্টিনিয়ানের আইন ইউরোপের সমস্ত দেশের আইনব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঃ জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর বিশাল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হল। একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছিল। সম্রাটদের প্রধান কাজ ছিল অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ করা। হত্যা, ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি, বিলাসিতা বাইজাণ্টাইন জীবনকে কলুষিত করে ফেলেছিল। একদিকে ঐশ্চর্য ও বিলাসিতা এবং অপরদিকে দারিদ্র্য, দাসত্ব, অত্যাচার ও নির্যাতন সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সম্রাটরা প্রায়ই ষড়যন্ত্রের শিকার হতেন এবং তাঁদের অনেককে এর ফলে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে এশিয়ার অনেক অঞ্চল পারসিকরা অধিকার করল। আরবরা জয় করল সিরিয়া ও মিশর। কনস্টান্টিনোপল ক্রমাগত আক্রান্ত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বিদেশী তুর্কীদের আক্রমণে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটল ও বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হল।

বাইজাণ্টাইন সভ্যতা ঃ বাইজাণ্টাইন সম্রাটের রাজধানী ছিল প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজানসিয়াম বা কনস্টান্টিনোপল। সম্রাট

কনস্টান্টাইন কয়েকটি উদ্দেশ্যে কনস্টান্টিনোপলকে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে সমগ্র রোম সাম্রাজ্য শাসন করা সুবিধাজনক ছিল। তাছাড়া, শহরটির ভৌগোলিক অবস্থান এমন ছিল যে, শত্রুদের পক্ষে শহরটি জয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সুরক্ষিত থাকার ফলে কনস্টান্টিনোপল জাঁকজমক, বিলাসিতা ও শিল্পকলার এক বিরাট কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মার্বেল ও সোনারূপার কাজ করা, বহুমূল্য রত্নখচিত বড় বড় গীর্জা, রাজপ্রাসাদ শহরটিকে অপূর্ব সুন্দর করে তোলে। পূর্বে কৃষ্ণসাগর এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ঘিরে রেখেছিল এই শহরকে। বস্তুত, শহরটি ছিল এশিয়া ও ইউরোপের মিলনস্থলে অবস্থিত। যখন লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা ছিল অখ্যাত অঞ্চল, সেই সময় কনস্টান্টিনোপল সমৃদ্ধশালী শহরে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন বাইজাণ্টাইন ছিল গ্রীক শহর। তাই বাইজাণ্টাইন সভ্যতা, ধর্ম-কর্ম, সংস্কার, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা প্রভৃতি সব বিষয়ই ছিল গ্রীক আদর্শে গড়া।

সম্রাটদের জীবনযাত্রা : সম্রাটরা খুব আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য তখনকার দিনে পৃথিবীতে প্রবাদস্বরূপ ছিল। রাজপ্রাসাদের সোনার গাছে মণিমুক্তাখচিত ফুল, ফল এবং সোনার পাখি যে কোন দর্শককে বিভ্রান্ত করত। রাজপ্রাসাদের মাথায় অবস্থিত যন্ত্রচালিত ঘড়ি বহুদূর থেকে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। প্রাসাদগুলির দেওয়ালে টুকরো কাঁচ আর পাথর দিয়ে তৈরী ছবি শোভা পেত। সম্রাটরা জমকালো পোশাক পরতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় তাঁরা বিভিন্ন রকম পোশাক পরতেন। দেশ বিদেশ থেকে অনেক রাজদূত সম্রাটের কাছে আসতেন। সম্রাট তাঁদের অভ্যর্থনা করতেন। সেই সময় প্রাসাদের সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্য তাঁদের দেখান হত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোনার তৈরী কয়েকটি সিংহ। সিংহগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে সেগুলি গর্জন করতে পারত।

সম্রাটরা ছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। প্রজাদের কাছে

তাঁরা দেবতার মত সম্মান পেতেন। তাঁদের সাহায্য করার জন্য বহু রাজকর্মচারী ছিল। তাঁরাও জমকালো পোশাক পরে প্রাসাদে উপস্থিত থাকতেন। দেশরক্ষার জন্য ছিল বহু সৈন্য। এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়া থেকে দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ, সৈনিকরা সর্বদা রাজপ্রাসাদ পাহারা দিত। রাজধানী রক্ষার জন্য ছিল শক্তিশালী নৌবহর। শহরের বিভিন্ন অংশগুলি সেতু দিয়ে যুক্ত ছিল। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট স্নানাগার, সুরক্ষিত দুর্গ ও সুবিশাল অট্টালিকা ছিল।

বাইজান্টাইন সৈনিকেরা জলযুদ্ধে এক অদ্ভূত ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করত। লম্বা লম্বা নলের মধ্য দিয়ে একপ্রকার তরল পদার্থ শত্রুপক্ষের জাহাজের দিকে তারা ছুঁড়ে মারত। এতে জাহাজে আগুন ধরে যেত। জল দিয়েও আগুন নেভান যেত না। এই অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রের নাম ছিল 'গ্রীক ফায়ার' বা 'গ্রীকদের আগুন'। এরই ফলে জলযুদ্ধে বাইজান্টাইন সৈনিকরা অজেয় হয়ে উঠেছিল।

সাধারণ মানুষের জন্যও রাজধানীতে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। রথ চালনার প্রতিযোগিতা তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। দুটি দলের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হত। দর্শকদের মধ্যেও দুটি দল ছিল। তারা নিজেদের দলকে উৎসাহ দিত।

বাইজান্টাইন শিল্প ও বাণিজ্য ঃ এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন প্রকার শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিল। স্থাপত্য শিল্প এই সময় উন্নতি লাভ করেছিল। সম্রাটরা এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। সম্রাটদের আনুকূল্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সেতু, স্নানাগার, দুর্গ, প্রাসাদ, গীর্জা ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আদেশে বিখ্যাত সেন্ট সোফিয়ার গীর্জা তৈরী হয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছর ধরে দশ হাজার লোক এটি তৈরী করে। বাইজান্টাইনের অধিবাসীরা সূচীশিল্প, কারুশিল্প, কাঁচশিল্প প্রভৃতিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। 'মোজেইক'-এর কাজ ছিল এখানকার লোকদের একটি প্রধান শিল্প। নানারঙের টুকরো টুকরো পাথর ও কাঁচ দিয়ে বাইজান্টাইন শিল্পীরা গীর্জা ও প্রাসাদের দেওয়ালে, ছাদে, মেঝেতে

বিভিন্ন রকমের ছবি আঁকত। এগুলিকেই বলা হয় মোজেইক। তারা নরুন আর বাটালি দিয়ে কাঠের উপর অপূর্ব সূক্ষ্ম কাজ করত। নানারকম জীবজন্তুর মূর্তিও তারা খোদাই করতে পারত। এইসব জিনিস ইটালি, ফ্রান্স এবং পূর্ব ইউরোপে রপ্তানি করা হত। প্রায় এক হাজার বছর ধরে কনস্টান্টিনোপল ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর ও বাণিজ্যের কেন্দ্র।

বাইজান্টাইন মোজেইক

এদের ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই প্রসার লাভ করেছিল। রাশিয়া, ইথিওপিয়া, ভারতবর্ষ, সিংহল, মিশর ও চীনে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য জাহাজগুলি যাতায়াত করত। চীনদেশ থেকে আনা গুটিপোকা থেকে রেশমশিল্পের সূচনা হয়। ইথিওপিয়া ও মিশর থেকে আসত হাতীর দাঁতের তৈরী জিনিস, সিংহল ও ভারতবর্ষ থেকে আসত সুগন্ধি মসলা, ওষুধ, শস্য, সূক্ষ্ম বস্ত্র, মূল্যবান পাথর এবং জাহাজ তৈরীর কাঠ। রাশিয়া থেকে আসত মধু, মোম, পশম এবং ক্রীতদাস।

ধর্মজীবন ঃ পোপ ছিলেন পশ্চিম ইউরোপের প্রধান ধর্মগুরু। তিনি রোমে থাকতেন। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা কিন্তু এই ধর্মগুরুকে মানতেন না। তাঁদের নিজস্ব ধর্মগুরু ছিল। তিনি বাস করতেন কনস্টান্টিনোপলে। পোপকে যারা মানত তারা 'ল্যাটিন খ্রীষ্টান' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা পোপকে মানত না বলে তারা 'গ্রীক খ্রীষ্টান' নামে পরিচিত ছিল। গ্রীক খ্রীষ্টানরা পূর্ব ইউরোপে বিশেষ করে রাশিয়ায় তাদের ধর্মমত প্রচার করেছিল।

এই সব আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাইজান্টাইন সভ্যতা এক সময় ইউরোপে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলাম ও তার প্রভাব

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পর আরো ছ'শো বছর তখন কেটে গেছে। উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছেন। মরুপ্রায় আরব দেশে তখন এক নতুন ধর্মের উত্থান হল। এই নতুন ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম এবং এই ধর্মের প্রবর্তকের নাম হজরত মহম্মদ।

আরব দেশের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল প্রাচীন সভ্যতার বহু কেন্দ্র; গড়ে উঠেছিল বহু প্রাচীন সাম্রাজ্য। মিশর, আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীক সামাজ্য, রোম সাম্রাজ্য সবই ছিল আরবের প্রতিবেশী। আরবের মরুময়তার জন্য এইসব প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি কিন্তু কখনও আরব অধিকার করেনি। আরব কথাটির অর্থ শুষ্ক। এই আরবেই ইহুদী ধর্মগুরু মুশা, ডেভিড ও সলোমনের আবির্ভাব হয়েছিল। মহম্মদের ধর্মের ওপরও ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব আছে।

আরব: আরব দেশের অধিকাংশই বালুময় মরুভূমি। এখানে ওখানে আছে কয়েকটি মরূদ্যান। সমুদ্রের ধারে খানিকটা উর্বর জমি আছে। সেখানেই কয়েকটা শহর ও গ্রাম গড়ে উঠেছিল। মক্কা ও মদিনা প্রধান শহর দুটিই লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত।

শুষ্ক কঠিন পরিবেশ এই দেশের অধিবাসীদের বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর করে তুলেছে। কৃষির অভাবে মেষ ও উট পালনই ছিল আরবদের প্রধান জীবিকা। মরুভূমির লোক সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত—বাদালী (শহরবাসী, স্থিতিশীল) এবং বেদুইন (যাযাবর, গতিশীল)। একদল মানুষ উর্বর জায়গাগুলিতে বসবাস করত এবং চাষ-আবাদ ও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। আর একদল অর্থাৎ বেদুইনরা মরুঅঞ্চলে বাস করত। এদের কোন ঘরবাড়ী ছিল না; এরা পশুপালন ও লুঠপাট করে বেঁচে থাকত। মরুভূমির মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াত নিজেদের পরিবার ও পালিত পশু নিয়ে। খুঁজে বেড়াত পশু চরাবার জায়গা। জায়গা খুঁজে পেলে তাঁবু ফেলে সেখানে

কিছুদিন থাকার পর আবার অন্য জায়গায় চলে যেত। এরা ছিল খুবই দুঃসাহসী ও স্বাধীনতাপ্রিয়।

আরব দেশের মানুষই একদিন বাইরে গিয়ে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, ফিনিসীয় ও ইহুদী সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যারা আরবেই স্থায়ীভাবে থেকে গেল, তারা সভ্য হতে পারল না। এদের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করত। প্রত্যেক উপজাতির একজন করে নায়ক ছিল। এই নায়কের উপাধি ছিল 'শেখ'। তিনি ছিলেন দলের সর্বময় কর্তা। মহম্মদের জন্মের আগে আরবদেশে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না।

প্রত্যেক গোষ্ঠীরই ছিল একজন দেবতা। দেবতার নামে আরবরা যুদ্ধ করত। প্রতি শুক্রবারে এরা বাজারে মিলিত হত। সেখানে কেনা-বেচা চলত। বাজারে নাচ-গান ও কবিতা আবৃত্তি হত, আর হত নানা দেবতার পূজো। বাজারের নাম ছিল 'ওক্কা'। কিন্তু প্রধান বাজারের নাম ছিল 'মক্কা'। এই বাজারের নাম থেকেই মক্কা শহরের নাম হয়েছে। মহম্মদের সময়ে মক্কা ছিল ইহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের মিলনস্থল।

আরবদের মধ্যে নানারকম কুপ্রথা ও কুসংস্কার ছিল। তারা অসংখ্য দেবদেবীর ও গাছপাথরের পূজো করত। মক্কার কাবাশরিফ ছিল প্রধান ধর্মমন্দির। কাবা মন্দিরে সাড়ে তিনশোর বেশী দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। আরববাসীরা সেই সব মূর্তি পূজো করত।
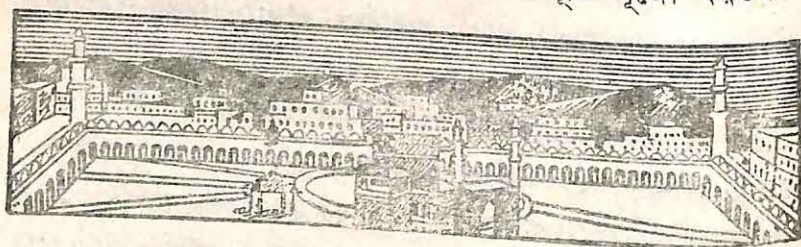
কাবাশরিফ

'কাবা' শব্দের অর্থ চৌকো জিনিস। পাথরের তৈরী কাবা মন্দিরে ছিল একটি চৌকো কালো পাথর। এই পাথরটি ছিল আরবদের

কাছে খুব পবিত্র। মক্কা ছিল প্রত্যেক আরববাসীর কাছেই এক পুণ্য তীর্থ। বসন্তকালে চার মাস সব শত্রুতা ভুলে আরবরা মক্কায় এসে জড়ো হত এবং কাবা মন্দিরে পূজো দিত।

আরববাসীরা ছিল খুব অতিথিপরায়ণ। লেখাপড়ার চর্চাও তারা করত। অনেক সুন্দর সুন্দর গান ও কবিতা এরা রচনা করেছিল।

হজরত মহম্মদঃ এই আরব দেশের মক্কা শহরে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম। মহম্মদের আসল নাম ছিল আবুল করিজম। মহম্মদের বাবার নাম ছিল আবদুল্লা আর মা-র নাম ছিল আমিনা। মহম্মদের জন্মের আগেই তাঁর বাবা মারা যান। মাত্র ছ'বছর বয়সে তিনি মাকেও হারান এবং পিতৃব্য আবুতালিবের পরিবারে আশ্রয় লাভ করেন।

মক্কার কাবাশরিফ রক্ষণাবেক্ষণ ও যাত্রীদের দেখাশুনা করার ভার ছিল কোরেশ বংশের লোকদের ওপর। এই বংশটি ছিল অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। হজরত মহম্মদ ছিলেন এই বংশের সন্তান।

মহম্মদ কোন বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষালাভ করেননি। ছোটবেলায় মেষ ও উট চরিয়ে তাঁর দিন কাটত। একটু বয়স হলে মহম্মদ আবুতালিবের অধীনে বণিকদলের সঙ্গী হয়ে সিরিয়ায় যান। এই সময় তিনি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্পর্শে আসেন এবং আরবদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার ছিল তা দূর করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধিমান ও কর্মী হিসাবে তাঁর খ্যাতি শুনে খাদিজা নামে একজন বয়স্কা বণিক মহিলা তাঁকে কর্মচারী নিযুক্ত করেন। মহম্মদের পরিচালনায় খাদিজার খুব আর্থিক লাভ হয়। পরে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন। খাদিজাই মহম্মদের বিখ্যাত কন্যা ফতিমার জননী।

চল্লিশ বছর বয়সে একদিন রাত্রে তিনি এক পর্বতের গুহায় ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। তিনি শুনতে পান যে, আল্লা তাঁকে বলছেন, তিনিই পৃথিবীতে আল্লাহর দূত। আল্লাহ ভিন্ন আর ঈশ্বর নেই। একথা শুনে খাদিজা তাঁকে উৎসাহিত করেন। মহম্মদ নিজেকে আল্লাহর দূত

হিসাবে প্রচার করেন। এইভাবে আরবের মরুভূমিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল।

একমাত্র ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে শেখান হয় বলে এই ধর্ম ইসলাম ধর্মরূপে পরিচিত লাভ করেছে। ইসলাম শব্দটির অর্থ হল ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করা। যাঁরা এই ধর্মে বিশ্বাস করতে লাগলেন তাঁরা মুসলমান বলে পরিচিত হলেন। সম্ভবত তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলে তাঁর সমস্ত বাণী সহযোগী বন্ধুরা গাছের পাতায়, শ্লেটের টুকরোয় বা ভেড়ার কাঁধের চওড়া হাড়ের ওপর লিখে নিতেন। এই লেখাগুলিই পরে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ 'কোরাণ' রূপে প্রকাশিত হয়।

ধর্মপ্রচার : মহম্মদ প্রথমে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। প্রথমে তাঁর স্ত্রী খাদিজা, পরিবারের কিছু কিছু লোক, কয়েকজন ক্রীতদাস এবং অত্যন্ত দরিদ্র কয়েকজন সাধারণ লোক ছাড়া অন্য কেউ মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেনি। মহম্মদের আত্মীয়-স্বজন তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। মদিনা ছিল মহম্মদের মা আমিনার জন্মস্থান। মদিনাবাসীর আমন্ত্রণে মহম্মদ মদিনায় পালিয়ে যান। মহম্মদের মক্কা থেকে চলে যাবার (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) সময় থেকে মুসলমানরা খলিফা ওমরের নির্দেশে তাঁদের বর্ষ (বা হিজরা) গণনা করেন।

অনেক মদিনাবাসী মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করল। মদিনাবাসী হল 'আনসার' বা 'সহায়ক'। কিছুদিনের মধ্যেই মদিনায় মহম্মদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল। হিজরতের দু'বছর পরে মদিনার কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামে এক জায়গায় এক হাজার মক্কাবাসীর সঙ্গে তিনশো মদিনাবাসী মুসলমানের যুদ্ধ হল। যুদ্ধে মহম্মদ জয়লাভ করলেন। এই যুদ্ধের পর থেকেই মুসলমান রাষ্ট্রের সূচনা হয়।

মহম্মদ ধর্মের নির্দেশ দিলেন—সকালে ধর্মের ডাক (আজান), শুক্রবারে সমবেত নামাজ (জুম্মা), রমজান মাসে উপবাস (রোজা), নামাজের সময় মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত এবং মক্কায় তীর্থযাত্রা (হজ)

৮ই হিজরীতে (৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে) মহম্মদ মক্কা জয় করলেন। দরিদ্রদের জন্য তিনি 'জাকাৎ' বা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করলেন এবং প্রত্যেক অ-মুসলমান প্রজার কাছ থেকে জিজিয়া কর নিতে আরম্ভ করলেন।

মক্কা অধিকার করার পর মহম্মদ কনস্টান্টিনোপল, পারস্য এবং চীনদেশের সম্রাটদের কাছে দূত পাঠালেন। চীনদেশে তাঁর জীবিত-কালেই ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়। ১০ই হিজরী (৬৩২ খ্রীঃ) মহম্মদ মক্কার বাৎসরিক তীর্থযাত্রা করলেন। এই তাঁর শেষ তীর্থযাত্রা। এইখানেই তিনি শেষ ধর্মপ্রচার করেন। মক্কা থেকে ফেরার তিনমাস পরে মদিনা শহরে মহম্মদ কঠিন আমাশা রোগে (কেউ কেউ বলেন শিররোগে) আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর। মুসলমানদের মতে মহম্মদ পৃথিবীর সর্বশেষ রসুল অর্থাৎ আল্লা প্রেরিত পুরুষ।

ইসলাম ধর্মের মূলকথা ঃ ইসলাম ধর্মের মূল কথাই হল আল্লাহ এক। মহম্মদ আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করা। ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমান মাত্রই অন্য মুসলমানকে ভাই মনে করবে।

ইসলাম ধর্মের প্রসার ঃ মুসলমান জীবনের মূলকথা হল এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কোরাণ। এই নতুন বিশ্বাস নিয়ে আরবরা ধর্মপ্রচারে বের হল। আরবরা যোদ্ধা, তাই যুদ্ধ করেই ধর্মপ্রচার করা সহজ বলে তারা মনে করল। তারা জেরুজালেম, সিরিয়া, পারস্য, মিশর ও উত্তর অফ্রিকা জয় করল। জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে তারা স্পেন দেশও অধিকার করল। পূর্বদিকে চীন সাম্রাজ্যের সীমান্ত ও সিন্ধুনদ পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হল। মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে এক বিস্তৃত অঞ্চলে আরব সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। মহম্মদের জীবিতাবস্থায় কিন্তু আরব দেশে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ-ছ হাজারের বেশী ছিল না।

মহম্মদের সামাজিক সংস্কার ঃ মহম্মদের আবির্ভাবের আগে আরবরা বহুবিবাহ, মদ্যপান, সুদগ্রহণ, কন্যাসন্তান হত্যা এবং

ক্রীতদাস প্রথা মেনে চলত। মহম্মদ নির্দেশ দিলেন, কোন মুসলমান একসঙ্গে চারটির বেশী বিবাহ করতে পারবে না এবং সারা

উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলামী সভ্যতার বিস্তার

জীবনে দশজনের বেশি মহিলাকে বিবাহ করা চলবে না। মদ্যপান, সুদগ্রহণ ও কন্যাসন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।। ক্রীতদাসদের

প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে মহম্মদের নির্দেশ গুলি পালিত হওয়ায় আরব দেশে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হল।

খলিফাঃ মহম্মদরে মৃত্যুর পর মুসলমানদের ধর্মগুরুরা খলিফা বলে পরিচিত হতেন। আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী, মহম্মদের এই চারজন প্রিয় শিষ্য পরপর খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই চারজন খলিফা ইসলামের ধর্মপরায়ণ খলিফা বা সাধু খলিফা নামে পরিচিত। খলিফারা মহম্মদের প্রতিনিধি। খলিফারা সমাজ পরিচালনা করতেন, মুসলমানদের রক্ষা করতেন আবার একই সঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। মুসলমান সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করাও ছিল খলিফাদের অন্যতম কর্তব্য। বস্তুত, খলিফারা একাধারে ইসলামের রক্ষক ও প্রচারক ছিলেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর মহম্মদের শ্বশুর আবুবকর খলিফা (৬৩২-৬৩৪ খ্রীঃ) নির্বাচিত হন। তিনি ধর্মভীরু, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, ধীর, স্থির ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

আবুবকরের মৃত্যুর পর মহম্মদের অন্যতম শ্বশুর ওমর খলিফা (৬৩৪-৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) হলেন। তিনি প্রথমে মহম্মদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু একদিন কাবার পথে মহম্মদের কণ্ঠে আজান ধ্বনি শুনে মুগ্ধ হলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। পরে মহম্মদ ওমরের বিধবা কন্যা হাফেজাকে বিবাহ করেন। ওমরের মৃত্যুর সময় মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ হল। অবশেষে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন পারস্য দেশীয় ক্রীতদাস ওমরকে মসজিদের মধ্যেই হত্যা করে।

ওমরের মৃত্যুর পর ওসমান (৬৪৪-৬৫৬ খ্রীঃ) খলিফা হলেন। তিনি কোরাণের বাণীগুলি একত্র করে বর্তমান আকারে প্রচার করেন। একদিন ওসমান যখন কোরাণ পাঠ করছিলেন, সেই সময় আবুবকরের পুত্র মহম্মদ ওসমানকে হত্যা করে।

ওসমানের পর আলী (৬৫৬-৬৬১ খ্রীঃ) খলিফা হন। এই সময় থেকেই খলিফার পদ নিয়ে আরবদের মধ্যে দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ওসমানের এক আত্মীয় সিরিয়ার শাসনকর্তা

মুয়াবিয়া বিদ্রোহ করেন আলীর বিরুদ্ধে। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী খলিফা আলী কুফার মসজিদের পথে নিহত হলেন। তাঁর মৃতদেহ নিতান্ত দীন দরিদ্রের মত কুফার কাছে সমাহিত করা হল।

কারবালার যুদ্ধ বা মহরম ঃ 'সাধু খালিফাদের' শাসনকাল শেষ হয়ে গেলে খলিফা পদ নিয়ে আরবদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। আলীর পুত্র হাসান ও হোসেনকে বঞ্চিত করে মুয়াবিয়া খলিফা হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম ওম্মিয়া বংশ। তাঁর পুত্র এজিদ পিতার মৃত্যুর পর খলিফা হন। এজিদ ছিলেন অত্যাচারী। এই অত্যাচারী এজিদ খলিফা হবার পর কুফাবাসীরা এজিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য হুসেনের কাছে আবেদন করে। নিজের পরিবার ও কিছু অনুচর নিয়ে হুসেন মরুভূমির পথে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কুফার পঁচিশ মাইল উত্তরে কারবালা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন যে, কুফাবাসীদের আবেদন আসলে চক্রান্ত মাত্র, এজিদের ফাঁদে তিনি পা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে এজিদের সৈন্যদল হুসেনকে ঘিরে ফেলল। জল নেই, খাবার নেই, চারদিকে শুধু বিশাল মরুভূমি। হুসেন আত্মসমর্পণ করলেন না। তিন দিনের মধ্যে নারী ও শিশুরা জলের অভাবে কাতর হয়ে উঠল। হুসেনের শিবিরে আর্তনাদ উঠল। ৬১ হিঃ, ১০ই মহরম তারিখে (৬৮০ খ্রীঃ) হুসেনের অনুচররা মৃত্যুবরণ করল। হুসেনের ছিন্ন মস্তক দামাস্কাসে এজিদের কাছে পাঠান হল। এজিদ দয়া করে হুসেনের ছিন্ন মস্তকটি তাঁর বোনের কাছে পাঠালেন। কারবালা প্রান্তরে সেই ছিন্ন মস্তকটি সমাহিত করা হল। হুসেনের মৃত্যুর দিন ১০ই মহরম। মুসলমানরা কারবালার ঐ শোচনীয় ঘটনার কথা স্মরণ করে আজও মহরম বা শোক দিবস পালন করে। কারবালা আজও মুসলমানদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। হুসেনের সমর্থকরা নিজেদের শিয়া বলে পরিচয় দেয়।

ওম্মিয়া বংশের রাজত্বকালে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। পূর্ব রোমান

সাম্রাজ্যের সঙ্গে আরবদের অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশে টুরের যুদ্ধে বীর চার্লস মার্টেল আরবদের পরাজিত করে পশ্চিম ইউরোপকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

আব্বাসীয় বংশ ঃ মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের নাম অনুসারেই তাঁর বংশের নাম হয়েছিল আব্বাসীয় বংশ। টাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত বাগদাদ ছিল আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুণ-অল রশীদ। এঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আরব্য উপন্যাস থেকে জানা যায়। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধন করার দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। গল্প আছে যে, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা জানবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে রাজধানী বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় গভীর রাত্রে ঘুরে বেড়াতেন।

বাগদাদ ঃ আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী বাগদাদ ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এক লক্ষ নিপুণ কারিগর চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই শহরটি তৈরী করেছিল। 'বাগদাদ' শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বরের দান'। শহরটি ছিল গোলাকার আর দু সারি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। শহরের মাঝখানে ছিল মার্বেল পাথরে গড়া খলিফাদের বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদটি ছিল নানা রকম গাছপালা, ফুলের বাগান, বহুমূল্য সোনারূপার জিনিসে ঠাঁসা এবং রেশমের পর্দা দিয়ে সাজান। রাজ প্রাসাদে সর্বদা সাত হাজার প্রহরী থাকত। খলিফার ছিল সাতশো দেহরক্ষী। খলিফারা সকলেই খুব সৌখীন ছিলেন। বাগদাদের এই সমৃদ্ধির ব্যাপারে ক্রীতদাসদাসীদের দান ছিল যথেষ্ট। যুদ্ধবন্দীকে দাস করা হত। এইসব দাসদাসী যে কেবল ভৃত্যের কাজ করত তা নয়, এদের মধ্যে জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ইত্যাদিও ছিল।

বাগদাদ শহরে দশলক্ষ লোক বাস করত। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল পেশায় বণিক। বহু ভারতীয়, গ্রীক এবং ইহুদী পণ্ডিত এই সময়ে বাগদাদে সমবেত হয়েছিলেন।

আরব সভ্যতাঃ আরবদের মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। হুনায়িন-ইবন ইসাক ছিলেন এ যুগের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকদের গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করা ছাড়াও নিজেই অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। আবুসিনা ছিলেন আরেক জন বিখ্যাত আরব চিকিৎসক। তিনিও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইবন রুশদ নামে স্পেনের একজন মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের গ্রন্থের ওপর একখানি টীকা রচনা করেন। অল-তবারী নামে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পৃথিবীর ইতিহাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অল-বিরুণী নামে অপর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সুলতান মামুদের সময় ভারতবর্ষে আসেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে তিনি হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি বই লেখেন। অল-বিরুণী জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধেও বই লিখেছেন। প্রসিদ্ধ ভূ-পর্যটক ইবনবতুতা মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় কয়েক বছর ভারতে কাটিয়েছিলেন।

মধ্যযুগে আরবরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় সভ্যজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে তারা শিখেছিল গণিতশাস্ত্রের সংখ্যাগুলি এবং বীজগণিত। চীন থেকে তারা শিখেছিল কাগজ তৈরীর কৌশল। চিকিৎসাশাস্ত্রে তারা নিজেরাই খ্যাতি অর্জন করেছিল। বস্তুত, তারা তাদের এই বিশাল জ্ঞানরাশি ইউরোপবাসীদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছিল।

স্পেনঃ স্পেনেও আরবরা একটি সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন করেছিল। স্পেনের আরবদের বলা হত মুর। প্রথম আবদুল রহমান স্পেনে আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তৃতীয় আবদুল রহমান স্পেনে প্রথম 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। এঁদের রাজধানী ছিল

কর্ডোভাতে। তৃতীয় আবদুল রহমানের পুত্র দ্বিতীয় হাকিম তাঁর গভীর বিদ্যানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময় কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মুসলমান ও ইহুদী শিক্ষার্থীরা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে এসে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করত। হাকিমের লাইব্রেরীতে ছিল প্রায় চারলক্ষ বই। এইসব পুস্তকের তালিকাই ছিল চুয়াল্লিশ খণ্ড। কর্ডোভাতে প্রায় প্রত্যেক মানুষই বিদ্যাচর্চা করত। লণ্ডন ও প্যারিসের রাস্তা যখন বর্ষায় কর্দমাক্ত এবং রাত্রে অন্ধকার, সেই সময় কর্ডোভার পথ পাথরে বাঁধানো ছিল এবং রাত্রে সেখানে পথে আলো দেবার ব্যবস্থা ছিল। কর্ডোভাতে লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। সাতশো মসজিদ, তিনশো স্নানাগার, সতেরটি লাইব্রেরী এবং সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ শহরটির শোভাবর্ধন করত। মর্মর পাথরে তৈরী চারশো কক্ষযুক্ত সুলতানের প্রাসাদটি ছিল অপূর্বসুন্দর। গ্রানাডা শহরে আলহামব্রা প্রাসাদটি স্পেনের আরব স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
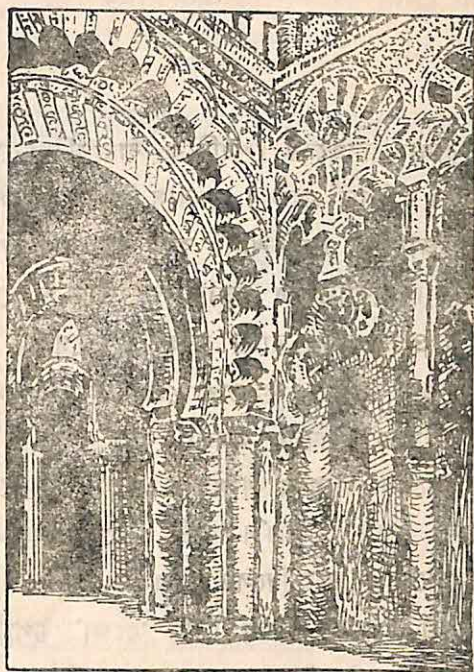
কর্ডোভার স্থাপত্য শিল্প

মুসলিম রাজত্বের সময় স্পেনের উৎপন্ন দ্রব্য সুদূর ভারতবর্ষ ও চীনের বাজারেও বিক্রী হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের স্পেন থেকে মরক্কোতে বিতাড়িত করে দেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
শার্লামানের কথা

রোমান রাজত্বের শেষদিকে বারবেরিয়ানদের ফ্রাঙ্ক শাখা গল অঞ্চলে (বর্তমান ফ্রান্স) বসবাস শুরু করেছিল। ফ্রাঙ্ক গোষ্ঠী ছিল জার্মান জাতিরই একটি শাখা আর এই ফ্রাঙ্ক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন ক্লোভিস। ক্লোভিসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্যটি ভাগ হয়ে যাওয়ায় ফ্রাঙ্ক রাজ্য দুর্বল হয়ে গেল। রাজ্যটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল হয়ে পড়ায় রাজার ক্ষমতাও গেল অনেক কমে। দেখতে দেখতে রাজার থেকে মেয়রের ক্ষমতা বেড়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে মেয়রই হয়ে উঠলেন রাজ্যের শাসক। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানরা ফ্রান্স আক্রমণ করল। চার্লস মার্টল নামে একজন মেয়র টুরের যুদ্ধে মুসলমানদের হারিয়ে দিলেন। বস্তুত, চার্লস মার্টলই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেন। কিন্তু তিনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মেয়র পাপিন পোপের অনুমতি নিয়ে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। পোপের প্রতি কৃতজ্ঞ পাপিন পোপের অনুরোধে লোম্বার্ডদের ইটালি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অধিকৃত অঞ্চল তিনি পোপকে দান করে দিলেন। এতদিন পোপ ছিলেন শুধুমাত্র ধর্ম জগতের গুরু। কিন্তু এই সময় থেকে পোপ রাজকীয় ক্ষমতারও অধিকারী হলেন। ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পাপিনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র কারলামান ও শার্লামান ফ্রাঙ্ক রাজ্যের রাজা হলেন। কারলামান বেশীদিন রাজত্ব করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে শার্লামান ফ্রাঙ্ক রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হলেন। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত চার্লস দি গ্রেট—পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

শার্লামানের আকৃতি ও প্রকৃতি ঃ এগিনহার্ড নামে শার্লামানের এক বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি শার্লামানের জীবনচরিত রচনা করেন। সেই জীবনী থেকে আমরা শার্লামানের চেহারা ও চরিত্রের

পরিচয় পাই। শার্লামান ছিলেন সাত ফুট লম্বা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ গঠন। তাঁর ছিল সাদা চুল, উজ্জ্বল চোখ, আর টিকালো নাক। দীর্ঘ চেহারা
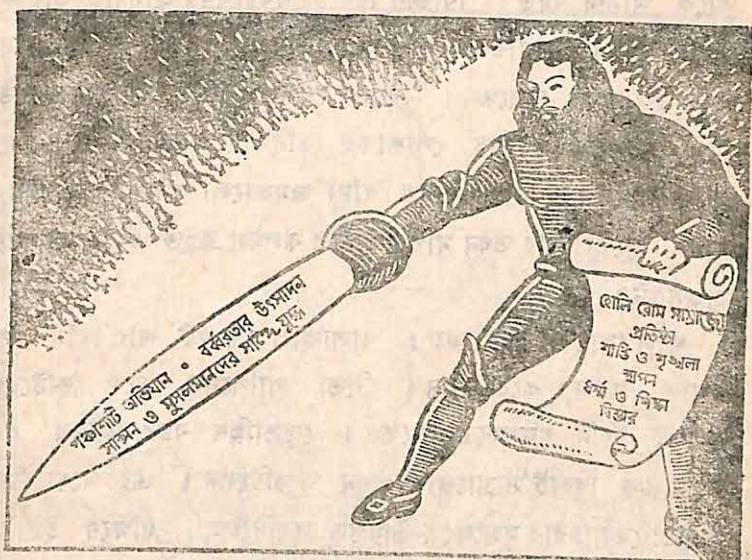
শার্লামান

নিয়ে যখন তিনি দাঁড়াতেন, তখন এক মুহূর্তে তাঁকে রাজা বলে চেনা যেত। তাঁর গায়ে ছিল হাতীর মত শক্তি। তরবারির এক কোপে তিনি একসঙ্গে অশ্বারোহী ও অশ্বকে কলাগাছের মত দুভাগ করে ফেলতে পারতেন।

পরিশ্রম করার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি সহজে ক্লান্ত হতেন না। সাঁতার কাটতে আর ঘোড়ায় চড়তে তিনি খুব ভালবাসতেন। শিকার করায় তাঁর ছিল গভীর আনন্দ। পোশাকেরও কি কম বাহার! তিনি কোট আর রূপোর কাজ করা মোজা পরতেন। তাঁর কোমরে সব সময়েই ঝুলত একটা তলোয়ার। তলোয়ারেরও কত কারুকাজ! তলোয়ারের হাতল আর বন্ধনীতে ছিল সোনা ও রূপোর ঝকঝকে সুন্দর কাজ। কিন্তু ভোজনে তাঁর বিলাস ছিল না। তাঁর ব্যবহারও ছিল মধুর। বন্ধু-বান্ধব এবং

কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি সহজ সরল এবং অমায়িক ব্যবহার করতেন। গল্পগুজব করতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। রহস্য, উৎসব ও রঙ্গরস তাঁকে আনন্দ দিত। বিভিন্ন বিষয়ে খবরাখবর জানবার তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। নানারকম প্রশ্ন করে তিনি বন্ধু, পার্শ্বচর ও পণ্ডিতদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। বিদেশী বেশভূষা তিনি ব্যবহার করতেন না। ফ্রাঙ্কদের জাতীয় পোশাকই তিনি পরতেন। উৎসবের দিনে তিনি পরতেন সোনার সুতোয় বোনা জমকালো পোশাক, মণিমুক্তো বসান জুতো, আর তখন মাথার ওপরে ঝলমল করত হীরে জহরতের রাজমুকুট।

শার্লামানের রাজ্য জয় ঃ বাল্যকাল থেকেই শার্লামান যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পিতা পাপিনের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করে তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি অন্ততঃ তেপ্পান্নবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। দক্ষিণে ইটালির লোম্বার্ডি, উত্তরে জার্মানির সাক্সনি, পূর্বে শ্লাভা ও পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। পোপের অনুরোধে তিনি শ্বশুর লোম্বার্ডির রাজা ডেসিডেরিয়াসকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি মঠে বন্দী করে রেখেছিলেন।

অনেকের সঙ্গেই তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে সাক্সনদের সঙ্গে শার্লামানের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ হয়। সাক্সনরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিল না। তারা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। শেষ পর্যন্ত শার্লামান সাক্সনদের হারিয়ে দেন এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার সাক্সনকে বন্দী করেন। শার্লামান ঘোষণা করেন যে সাক্সনদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ফলে, প্রাণের মায়ায় বহু সাক্সন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাক্সন দেশে বহু গীর্জা, রাজপথ ও সেতু নির্মাণ করে দিলেন।

এই তো গেল সাক্সন জয়ের কথা, এরপর স্পেন। স্পেনে আরবদের মধ্যে গোলযোগ শুরু হলে আরব দেশের কয়েকজন প্রধান

ব্যক্তি শার্লামানকে স্পেন আক্রমণ করার পরামর্শ দিল। শার্লামান এই সুযোগ লুফে নিলেন। এরপর তিনি সসৈন্যে স্পেনের দিকে
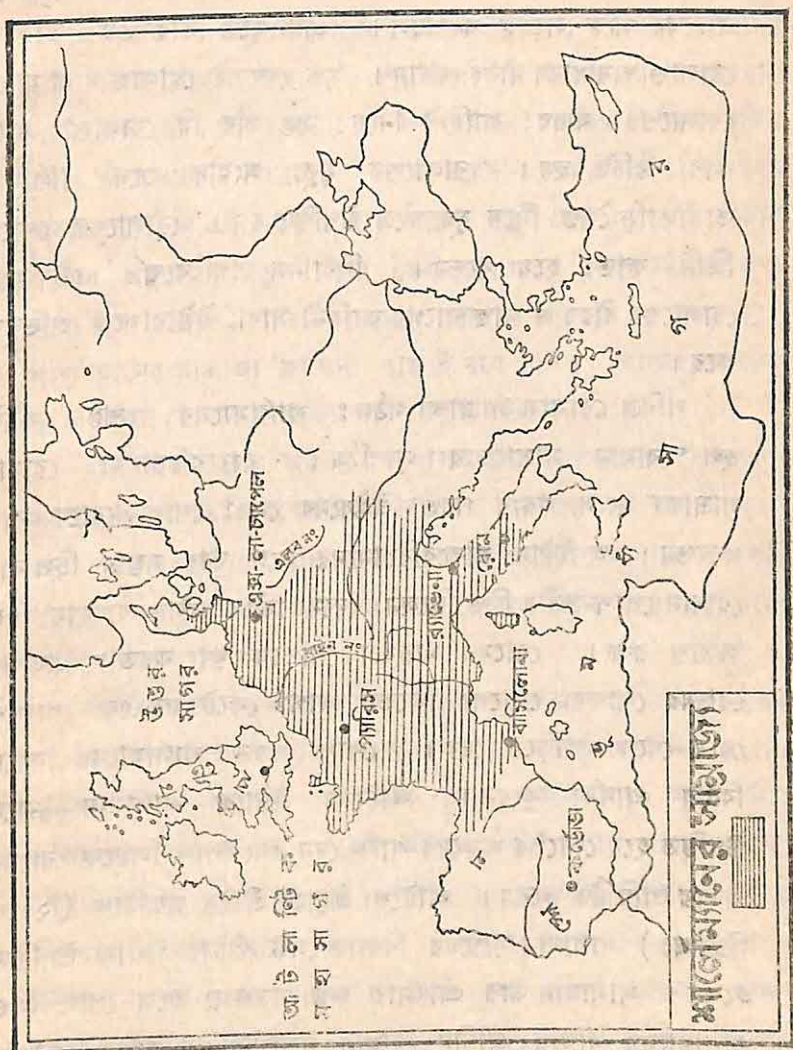
অগ্রসর হন। শুরু হল যুদ্ধ। সেখানে যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ শার্লামান খবর পান যে সাক্সনরা বিদ্রোহ করেছে। আর দেরি না করে, সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি স্পেন থেকে চলে আসেন। চলে

আসার সময় সৈন্যদলের শেষ অংশ যখন পিরানিস গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আরবরা তাদের আক্রমণ করে এবং ওদের এই অতর্কিত আক্রমণে এরা বিধ্বস্ত হয়। শার্লামানের সৈন্যদলও খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল। এই যুদ্ধে তাঁর এক ভাইপো রোলাণ্ড অসাধারণ বীরত্ব দেখান। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই রোলাণ্ড মারা যান। রোলাণ্ডের বীরত্ব কাহিনী নিয়ে 'সঙ অব দি রোলাণ্ড' নামে কাব্য রচিত হয়। রোলাণ্ডের মৃত্যু সংবাদ শুনে শার্লামান তাড়াতাড়ি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। রোলাণ্ডের শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। পিরানিস গিরিবর্ত্মের এই যুদ্ধে রোলাণ্ডের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী সারা ইউরোপকে অভিভূত করে।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠন ঃ শার্লামানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন। বারবেরিয়ানরা রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পরও খ্রীষ্টধর্মের নেতা পোপ রোমে বাস করতেন। অ-খ্রীষ্টান বারবেরিয়ানদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। রোমান পোপ তৃতীয় লিও ছিলেন বদমেজাজী। তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত রুক্ষ। রোমের মানুষরা পোপকে ঘৃণা করত। একবার রোমের লোকরা পোপের জিভের আগা কেটে দেয় এবং পোপকে রোম থেকে তাড়িয়ে দেয়। পোপ তখন শার্লামানের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। আটশো খ্রীষ্টাব্দে শার্লামান রোমে উপস্থিত হয়ে পোপের শত্রুদের শাস্তি দেন এবং পোপ লিওকে রোমের গীর্জায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আটশো খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টের জন্মদিনে (২৫শে ডিসেম্বর) শার্লামান রোমের বিখ্যাত সেন্ট পীটার গীর্জায় উপস্থিত হলেন। শার্লামান তাঁর প্রার্থনার জন্য নতজানু হলে পোপ লিও শার্লামানের মাথায় প্রাচীন রোমান সম্রাটের এক স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দিলেন এবং তাঁকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা পবিত্র রোম সম্রাট অগাষ্টাস শার্লামানের জয়ধ্বনি করে উঠল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট শার্লামান (৮০০-৮১৪ খ্রীঃ) ঃ ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লামান হলেন রোমের সম্রাট। অ-খ্রীষ্টান বারবেরিয়ানরা রোম অধিকার করায় রোমান সাম্রাজ্য অপবিত্র হয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টান সম্রাট শার্লামান রোমের সম্রাট হবার পর রোমান সাম্রাজ্য হল 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' এবং শার্লামান হলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম পবিত্র সম্রাট। শার্লামানের রাজধানী ছিল রাইন নদীর তীরে আখেন শহরে। 'পবিত্র রোমান সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করার পর তিনি এই শহরটির নাম দিলেন নতুন রোম। সেন্ট পীটার গীর্জার অনুকরণে নতুন গীর্জা তৈরী করা হল। শার্লামানের কথ্য ভাষা ছিল জার্মান। তিনি রোমান আইন অনুসরণ করতেন না। শার্লামানের সাম্রাজ্য 'ফ্রাঙ্কিস' রাজ্যই রয়ে গেল। রোমের নামটুকু ছাড়া পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য আর কিছুই রইল না।

শার্লামান ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ শাসক এবং উন্নতমানের সুসংগঠক। সমগ্র দেশকে তিনি কয়েকটি কাউনটি বা বিভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রতি বছর বসন্তকালে শার্লামান রাজধানীতে প্রজাসাধারণের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করতেন এবং সেখানে তিনি প্রজাদের নানা অভিযোগ শুনতেন।

শার্লামানের শিক্ষানুরাগ ঃ শার্লামান লেখাপড়া নিজে জানতেন না, কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল খুব আগ্রহ। তিনি ল্যাটিন ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন এবং গ্রীক ভাষা বুঝতেন। অবশ্য তাঁর মাতৃভাষা ছিল জার্মান। শেষ জীবনে তিনি অক্ষর লেখার চেষ্টা করেছিলেন। গল্প আছে যে, শোবার সময়ে তিনি বালিসের নীচে লিখবার সরঞ্জাম রেখে দিতেন। খাবার সময় চারণরা তাঁকে ইতিহাসের বই পড়ে শোনাত। তিনি বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজ-দরবারে আমন্ত্রণ করেন। ওঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের আলকুইন ছিলেন অন্যতম। আলকুইন এবং ইটালি থেকে আগত পণ্ডিতরা শার্লামানের সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সব পণ্ডিতদের সাহায্যে শার্লামান রাজপ্রাসাদের মধ্যেই একটি বিদ্যালয়

গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে রাজপরিবার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশের লোকদের সঙ্গে শার্লামান নিজেও লেখাপড়া করতেন। সাম্রাজ্যের কোথাও কোন প্রতিভাশালী ছেলের সন্ধান পেলে তাকে তিনি রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দিতেন। তাঁর সঙ্গে ইউরোপের বহু বিখ্যাত মনীষীর পত্রালাপ চলত। জ্ঞানের প্রসারের জন্য তিনি পুস্তকের অনুলিপি (নকল) করার ব্যবস্থা করেন। তাঁর চারদিকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের সভা গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন সেই জ্ঞানী সভার ডেভিড (প্রাচীন জ্ঞানী ইহুদী রাজা)। আলকুইন ছিলেন ডেভিডের উপদেষ্টা। অন্যান্য পণ্ডিতদের তিনি হোমার (গ্রীসের কবি), পিণ্ডার (গ্রীসের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক), সামুয়েল (ইহুদী জ্ঞানী), জামেরিয়া (ইহুদী ধর্মগুরু) প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন।

শার্লামান যে যুগে সম্রাট হয়েছিলেন, ইউরোপের সেই যুগকে অন্ধকারময় যুগ বলা হয়। বস্তুত, রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল অজ্ঞতার অন্ধকার। অর্থনৈতিক দুর্দশায় ও রাজনৈতিক অরাজকতায় ইউরোপের জীবনযাত্রা হয়েছিল বিপর্যস্ত। এই অন্ধকার যুগে শার্লামান জ্বালিয়েছিলেন সংস্কৃতির আলো। ইতিহাসে তিনি শুধু একজন দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা বা সম্রাটরূপেই পরিচিত নন, সভ্যতার বাহনরূপেও তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাই ইতিহাসে তাঁকে গ্রেট বা মহান উপাধি দেওয়া হয়েছে।

শার্লামানের উত্তরাধিকারী : শার্লামান যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইউরোপে আবার শুরু হয় রাজ্য দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্ষমতা-লাভের যুদ্ধে এবার যোগ দেন পোপ। শার্লামানকে সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন রোমের পোপ। তাই সম্রাটের চেয়ে পোপই যে শ্রেষ্ঠ, সেকথা প্রমাণ করতে চাইলেন পোপ। কিন্তু সম্রাটরা সেকথা স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। ফলে এই দুই শক্তির মধ্যে এক তীব্র বিরোধ ঘনিয়ে উঠল এবং ইউরোপের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের শুরু হল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের মঠজীবন

যাজক বা পুরোহিতের জীবন ঃ খ্রীষ্টান চার্চের সর্বপ্রধান গুরু হলেন পোপ। রোম হল তাঁর বাসস্থান ও কর্মকেন্দ্র। খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু হিসাবে ইউরোপের সমস্ত মানুষের ওপর পোপের প্রভাব ছিল। দেশের রাজা শুধু তাঁর নিজের প্রজাদের ওপরই রাজত্ব করতেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও মানুষের ধর্মজীবনের প্রধান নির্দেশক হিসাবে পোপ পেতেন ইউরোপের রাজা উজীর সমস্ত লোকের আনুগত্য।

পোপ ইউরোপের খ্রীষ্টান এলাকাকে কতগুলি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রতিটি প্রদেশের প্রধান যাজককে বলা হত আর্চবিশপ বা প্রধান যাজক। প্রদেশগুলি আবার বিভক্ত ছিল কতগুলি ডায়েসেস বা জেলায়। এগুলির প্রধান পুরোহিতকে বলা হত বিশপ। ডায়েসেস আবার বিভক্ত ছিল কতগুলি প্যারিসে। প্যারিসের প্রধান যাজকের নাম প্রীস্ট। এই রকম সংগঠনের মধ্য দিয়ে পোপ ইউরোপের সমস্ত খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন। চার্চ কতগুলি আইন তৈরী করেছিল। এই আইনগুলি ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে প্রচার করা হত। এই আইন না মানাটাকে পাপ বলে ভাবা হত। ঐ আইনগুলি অমান্য করার সাহস রাজারও ছিল না।

মধ্যযুগে চার্চ ছিল সবচেয়ে বেশী জমির মালিক। বস্তুত, চার্চ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জমির মালিক হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে অধিকাংশ বিশপই বিরাট ধনী, অত্যাচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণ ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিশপরাই ছিলেন সমাজের একমাত্র শিক্ষিত শ্রেণী। সেকালে যা কিছু বিদ্যাচর্চা তা এঁরাই করতেন। অবশ্য সব যাজকই শিক্ষিত ছিলেন না। ধর্মযাজক বা পুরোহিত গীর্জায় প্রার্থনা পরিচালনা করতেন। তাঁরা ধর্মীয় উৎসবে পৌরোহিত্য করতেন, বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিতেন ও রোগের

ওষুধ বিতরণ করতেন। কখন বা হাসপাতাল পরিচালনা করতেন। কখনো কখনো রাজার উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতেও তাঁদের দেখা যেত। যাজকরা বিয়ে করতে পারতেন না। তাঁদের জীবন ঈশ্বরের কাজে উৎসর্গ করতে হত।

মঙ্ক ও নান: যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি অংশ ছিল যাঁরা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন এবং বিদ্যাচর্চা ও ধর্মসাধনায় সম্পূর্ণভাবে ডুবে থাকতেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ দুই-ই ছিলেন। পুরুষদের বলা হত 'মঙ্ক' আর মেয়েরা 'নান' নামে পরিচিত ছিলেন। পুরুষদের মঠকে 'মনাস্টারি' এবং মেয়েদের মঠকে 'নানারি' বলা হত। সন্ন্যাসীদের মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত এ্যাবট। সন্ন্যাসিনীদের মঠের অধ্যক্ষার নাম ছিল এ্যাবেস। এই সন্ন্যাসীরাও আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অষ্টম শতাব্দীতে সেণ্ট বেনিডিক্ট যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন, সেটাই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত। বেনিডিক্টের নাম অনুসারে এদের বেনিডিক্টিন সম্প্রদায় বলা হয়।

মঙ্ক

আত্মত্যাগ, সেবা, দরিদ্র জীবন-যাপন, শুচিতা, ধর্মানুবর্তিতা ও বিদ্যা-চর্চার জন্য এই সম্প্রদায়গুলি বিখ্যাত ছিল। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁদের বলা হয় ফ্রায়ার অর্থাৎ ভাই। তাঁরা লোকালয়ে এসে জনসাধারণের সেবা করতেন। এঁরা খুব পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন এবং ভিক্ষা করে গরীবদের সাহায্য করতেন ও সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন।

মঠ-জীবন ঃ মঠ-জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। প্রত্যেক মঠেই একজন অধিকার বা অধিকারিণী থাকতেন। তিনিই হতেন সর্বময় কর্তা বা কর্ত্রী। এঁরা গাউন, বেল্ট ও ক্রুশ পরতেন। নিজস্ব বলতে এঁদের একটি কলম বা একটি বইও থাকত না। এঁরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাত্যাগ, যথা সময়ে প্রার্থনা, পাঠ, স্নান ও ভোজন করতেন। মঠবাসী এইসব অধিকারী বা অধিকারিণীরা ছিলেন একান্ত স্বাবলম্বী
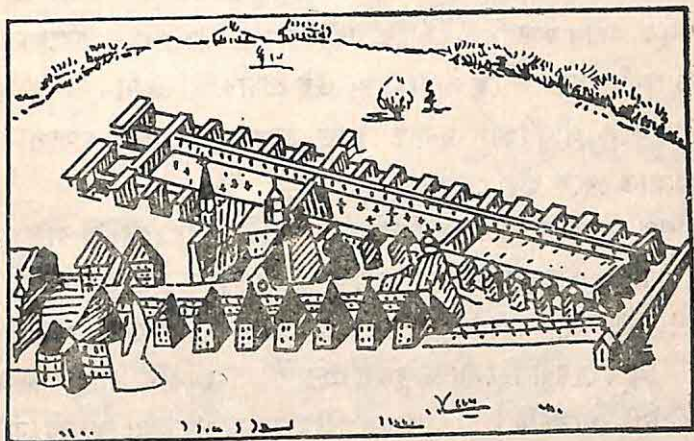
মধ্যযুগের মঠ

আর বইপত্র পড়েই কাটত এঁদের অবসর সময়। এইসব প্রত্যেক মঠেই ছিল লাইব্রেরী, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগার, পশুশালা ইত্যাদি।

দশম শতাব্দীতে অনেক মঠ যেমন বিদ্যা ও ধর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তেমনি অর্থ সঞ্চয়ে মন দিয়ে কোন কোন মঠবাসী বিলাসী, অলস এবং পানাসক্তও হয়ে উঠছিলেন।

ক্লুনী (Cluny) ঃ দশম শতাব্দীতে গীর্জায় নানারকম দুর্নীতি দেখা দিল। ষড়যন্ত্র, হত্যা ও ঘুষ, কিছুই বাদ গেল না। সুযোগ পেয়ে কয়েকজন অযোগ্য পোপ দখল করলেন গীর্জার ক্ষমতা। তার ফলে মঠগুলিতে ধর্মচর্চা এবং শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিল। অসৎ চরিত্র, অলস এবং সঙ্কীর্ণমনা সন্ন্যাসীতে মঠগুলি ভরে গেল। চার্চের

ভেতরেও শুরু হল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। এমন কি যাজকরা বিবাহ করতে শুরু করলেন, এবং গীর্জার সম্পত্তি তাঁদের সন্তানরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে লাগল। গীর্জার মাধ্যমে যাজকরা আত্মীয়-স্বজনদেরও পোষণ করতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু এই মঠ-ব্যবস্থাই আবার গীর্জাকে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করল। মঠাধ্যক্ষ ওডিলিও ক্লুনী (৯৯৪-১০৪৯ খ্রীঃ) এবং তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসীরা সমগ্র ইউরোপে সংস্কারকার্য চালালেন এবং গীর্জাকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য নির্ভীকভাবে রাজার কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন। আজও স্মরণীয় হয়ে আছে সন্ন্যাসীদের এই প্রচার অভিযান। এঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে গীর্জাগুলি দুর্নীতির হাত থেকে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল।

বিশপ নিয়োগ সংক্রান্ত বিবাদ ঃ সম্রাট তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাঁর পুত্র চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালে পোপের সঙ্গে রাজার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। চতুর্থ হেনরী ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির এবং তিনি লেখাপড়াও খুব একটা শেখেননি। পোপ গ্রেগরী জনসাধারণ ও যাজকদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন। জনসাধারণের দ্বারা অধিষ্ঠিত হলেও পোপ ছিলেন উৎসাহী সংস্কারক। তিনি সব বিবাহিত যাজকদের গীর্জা থেকে বের করে দিলেন। এতে যাজকরা গ্রেগরীর ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু গ্রেগরী বুঝতে পারলেন যে তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা স্বয়ং জার্মান সম্রাটেরও নেই। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক ঘোষণার মাধ্যমে যাজকের পদে নতুন করে অধিষ্ঠিতকরণ বন্ধ করে দিলেন এবং এ আদেশ যিনি অমান্য করবেন তাঁকেও তিনি গীর্জা থেকে বের করে দেবার ভয় দেখালেন। পোপের অনুমতি ছাড়া শাসকের কাছ থেকে ভূমিদান গ্রহণও নিষিদ্ধ করা হল। যদিও চতুর্থ হেনরীর সঙ্গে পোপের সামরিক মিটমাট হল, কিন্তু পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে সংঘর্ষ দীর্ঘদিন চলেছিল। দীর্ঘদিন পরে ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ এবং সম্রাটের

মধ্যে এক চুক্তি হল। চুক্তিতে বলা হল জার্মান সম্রাটরা বিশপ নিয়োগ অনুমোদন করবেন এবং গীর্জাতে বিশপ নিয়োগের অবাধ নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হল না। কার্যক্ষেত্রে বিশপ নির্বাচনের ব্যাপারে জার্মান সম্রাটরা কিছুই করতে পারলেন না। জার্মান ডিউক বা জমিদাররা প্রকৃতপক্ষে রাজা এবং গীর্জার এই দ্বন্দ্বে শক্তিশালী হলেন। শহরগুলি আরও বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতে লাগল এবং সাধারণ মানুষ যাজকদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। প্রয়োজনে গীর্জার সংস্কারেও মানুষ উৎসাহী হল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় বলতে প্রথমেই আমাদের মনে আসে বড় বড় বাড়ী, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস ইত্যাদি। মধ্যযুগে কিন্তু ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এসব কিছুই ছিল না। কয়েকজন শিক্ষক মিলিত হয়ে একটি শিক্ষালয় গঠন করতেন। তাঁদের কাছে ছাত্ররা এসে শিক্ষালাভ করত। এই সব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকেই ছাত্র ও শিক্ষক যোগদান করতে পারতেন। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগে চার্চ ও মঠগুলি ছিল বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষা ও শিক্ষিতের ভাষা ছিল ল্যাটিন। যাজক ও মঙ্করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপের নানাস্থানে মঠ ও মঠচারী পণ্ডিতদের কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। দেখতে দেখতে এভাবে প্রায় আশিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আপনা-আপনি গড়ে উঠত। ছাত্ররা এসে পণ্ডিত ও জ্ঞানী শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হত। প্রথমে ছাত্র ও শিক্ষক মিলিত হয়ে সংঘ তৈরী করেছিলেন। পরে এই সংঘগুলি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত পিটার এবেলার্ডের বক্তৃতা শুনতে ইউরোপের নানাস্থান থেকে লোক আসত, এভাবেই পিটার এবেলার্ডকে

কেন্দ্র করে পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বিশ্বের নানা জায়গার ছাত্র ও শিক্ষকদের দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল বলে একে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হত। আবার একদল ছাত্র ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত। জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা থেকেই আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করার আগ্রহ এত গভীর ছিল যে, দূর-দূরান্তর থেকে বৃদ্ধ এবং যুবকরা পায়ে হেঁটে, বহু কষ্ট সহ্য করে, এক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আর এক শিক্ষাকেন্দ্রে যেতেন।

ছাত্র জীবন ঃ মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বড় বড় গ্রন্থাগার বা গবেষণাগার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অনেকটা মঠের মত। তাই ইচ্ছা করলে শিক্ষক ও ছাত্ররা এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারতেন। এমনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যেখানে শিক্ষকদের নির্দিষ্ট বক্তৃতা দিতে হত না। ছাত্ররা বাঁধানো মেঝেতে বসে বক্তৃতা শুনত। তখনও মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। ছাত্ররা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিই ব্যবহার করত। বইয়ের সংখ্যাও ছিল খুব কম। সেইজন্য বাড়ীতে পড়াশুনা করা সম্ভব হত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শয়ে শয়ে ছাত্র আসত এবং অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনত অথবা পাণ্ডুলিপি নকল করত। ইটালিতে সালেরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা, বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্য, অঙ্ক ও ধর্মশাস্ত্র খুব ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। কয়েকজন ইংরেজ ছাত্র এক সময় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে ইংলণ্ডে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকরা মিলে এক একটি সংঘ বা গিল্ড তৈরী করতেন। এই সংঘকে বলা হত 'নেশন'। বিভিন্ন নেশন বিভিন্ন রঙের পোশাক পরত। কোন এক বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে ছাত্ররা গৌরববোধ করত। এর ফলে তাদের মধ্যে একটা একত্ব বোধ এসেছিল। কিন্তু এদের জীবনে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যেত। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই

শহরবাসীদের বিবাদ বেধে যেত। ছাত্ররা 'গাউন' পরত বলে লোকে এই বিবাদকে 'গাউন' ও 'টাউন'-এর বিবাদ বলত। শহরবাসীদের সঙ্গে মারামারির ফলে অনেক সময় শিক্ষক ও ছাত্রদের শহর থেকে বের করে দেওয়া হত।

মধ্যযুগের সংস্কৃতি ঃ মধ্যযুগে একদা পণ্ডিতকে বলা হত 'স্কুলমেন'। তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। অন্ধভাবে কোন জিনিস মেনে না নিয়ে এঁরা যুক্তি দিয়ে সে জিনিসটিকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। এই ভাবেই ভবিষ্যৎ যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল। 'স্কুলমেন'-দের মধ্যে ফরাসী পণ্ডিত পিটার এবেলার্ড ছিলেন সব চাইতে প্রসিদ্ধ। অনেকের মতে সক্রেটিসের পরে এত বড় জ্ঞানী পণ্ডিত আর জন্মগ্রহণ করেননি। জার্মান পণ্ডিত আলবার্টও ছিলেন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি। বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি এত বই লিখে গেছেন যে তাঁর মত লেখক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। টমাস একুয়াইনাস ছিলেন আলবার্টের শিষ্য। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলেও তিনি আঠারখানি বড় বই লিখে রেখে গেছেন। শোনা যায়, তিনি পড়াশুনায় এত মগ্ন থাকতেন যে খাবার সময় তাঁর থালা সরিয়ে অন্য থালা রেখে দিলেও তিনি তা বুঝতে পারতেন না।

রোজার নামে একজন বৈজ্ঞানিকের এই সময় আবির্ভাব হয়। তিনি জাতিতে ছিলেন ইংরেজ। তিনি বর্তমান বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক। তিনি লিখেছিলেন যে যানবাহন নিজে নিজেই চলবে এবং পাখনাযুক্ত এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে যে সেই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ আকাশে পাখীর মত উড়ে চলবে। বারুদ এবং বাষ্পীয়শক্তি সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত গভীর জ্ঞান ছিল। যাজকরা তাঁকে 'শয়তানের বন্ধু' আখ্যা দিয়েছিলেন।

দেশীয় সাহিত্য ঃ মধ্যযুগে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা নিজেদের মধ্যে ল্যাটিন ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। যা কিছু পুঁথিপত্র ছিল তাও ল্যাটিনেই লেখা হত। সাধারণ মানুষ এগুলি বুঝতে পারত না। তারা নিজেদের দেশীয় ভাষায় কথাবার্তা বলত। সেই সময় ইউরোপের সব দেশেই জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

ফরাসী ও জার্মান চারণ কবিরা দেশীয় বীরদের বীরত্বকে কেন্দ্র করে দেশীয় ভাষায় গান ও গাথা রচনা করতে আরম্ভ করেন। এই চারণ কবিদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের 'ট্রবাডর' এবং জার্মানির 'মিনিসিঙ্গাররা'। শার্লামানের পার্শ্বচর বীর রোলাণ্ডের বীরত্ব-কাহিনী নিয়ে ফ্রান্সে সবচেয়ে সুন্দর কাব্য রচিত হয়েছিল।

ইংলণ্ডের রাজা আর্থার ও তাঁর গোল টেবিলের নাইটদের নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। দস্যু রবিন হুডের বীরত্ব-কাহিনী নিয়ে ইংলণ্ডে অনেক জনপ্রিয় গাথা রচিত হয়েছিল। দস্যুদের নিয়ে রবিন হুড ধনী লোকদের অর্থ লুঠ করতেন এবং সেই অর্থ দিয়ে গরীবদের সাহায্য করতেন। ধনিক, বণিক ও যাজক সম্প্রদায় ছিল তাঁর শত্রু। দরিদ্ররা ছিল তাঁর দয়া ও সহানুভূতির পাত্র। জনসাধারণ তাঁকে আদর্শ মানুষ বলে মনে করত।

চসার

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দান্তে। তিনি ইটালীতে বাস করতেন। তিনি ইটালী ভাষায় 'ডিভাইন কমেডি' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন। দান্তেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। চসার এই যুগের আর একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি। তাঁর 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস্' বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মধ্যযুগে স্থাপত্য শিল্পে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হয়েছিল। এর নাম 'গথিক' স্থাপত্য। গথিক রীতির আবির্ভাব হয় ফ্রান্সে। এই গথিক রীতিতে সুন্দর সুন্দর গীর্জা তৈরী হয়েছিল। রীমজের গীর্জা গথিক স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

সপ্তম অধ্যায়

সামন্ত প্রথা

মানুষের ইতিহাস এক নিরবচ্ছিন্ন ভাঙা গড়ার ইতিহাস। অতীতে যা ছিল তা আজ নেই, আবার আজ যা আছে ভবিষ্যতে তা থাকবে না। আজকের জগৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, আবার আগামী দিনে গড়ে উঠবে আর এক নতুন জগৎ। এই ভাবেই ইতিহাস দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভাঙা গড়ার পথ ধরে এগিয়ে চলার মধ্যেই গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ সভ্যতা।

মধ্যযুগে ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় জার্মানরা। তাই মধ্যযুগের প্রথম লক্ষণ হল জার্মানদের প্রাধান্য। মধ্যযুগের দ্বিতীয় লক্ষণ হল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা চার্চ। রোমান সম্রাটের বিরোধিতা সত্ত্বেও খ্রীষ্টান ধর্ম দ্রুত সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছিল। অবশেষে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রীষ্টান ধর্মকে বৈধ বলে ঘোষণা করলেন। মধ্যযুগে রাজশক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খ্রীষ্টান চার্চ ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করে। মধ্যযুগের ইতিহাসে তৃতীয় ও শেষ প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ফিউডালিজম বা সামন্ত প্রথা। এই সামন্ত প্রথায় সংগঠিত সমাজের ছবিই সমগ্র মধ্যযুগের প্রকৃত ছবি।

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব: বর্বরদের আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র ইউরোপের বুকে নেমে আসে এক প্রচণ্ড অরাজকতা। শক্তিশালী রাজ্যও ছিল না, শক্তিশালী রাজাও ছিলেন না। ফলে, বিশৃঙ্খলা দূর করার কোন উপায় রইল না। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হল, পথে ঘাটে চোর ডাকাতের উপদ্রব দেখা দিল। সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ায় এক জায়গার লোকের সঙ্গে আর এক জায়গার লোকের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সাধারণ মানুষ ছেড়ে দিল স্থানীয় শক্তিশালী লোকদের হাতে। আর এই শক্তিশালী লোকদের শাসন তারা স্বেচ্ছায় মেনে নিল এবং তাদের প্রভু বলে স্বীকার করে নিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে জমিই একমাত্র সম্পদ হয়ে দাঁড়াল। আর এই প্রভুরাই হলেন জমির মালিক। ঐ জমি আর প্রভুকে আঁকড়ে ধরেই মানুষ ছোট ছোট এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এক একটি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হল। এই শক্তিশালী জমির মালিকরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকায় রাজত্ব করতে লাগলেন। এঁরাই পরিচিত হলেন সামন্ত নামে। ক্রমে ক্রমে এই সামন্তরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। এঁরাই হয়ে উঠলেন সমাজের প্রধান শক্তি। তাই ঐ সময়ের সমাজ 'সামন্ত-সমাজ' নামে পরিচিত।

সামন্ত শ্রেণী: রাজাই ছিলেন প্রথম এবং প্রধান মালিক, রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজা ভূসম্পত্তি বিলি করে দিতেন কয়েকজন প্রধান সামন্তকে। প্রধান সামন্ত আবার জমি বিলি করতেন কতগুলি ছোট সামন্ত বা উপসামন্তকে। উপসামন্তরাও আবার জমি বিলি করতেন অধঃস্তন কতগুলি জমিদারকে। এমনি করেই রাজা থেকে ক্ষুদ্রতম জমিদার পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জমি ভাগাভাগি হয়ে যেত। বিভিন্ন স্তরের মালিকদের মধ্যে কেউই তাঁদের জমির সবটা বিলি করতেন না। কিছু অংশ রেখে দিতেন সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে। নিজেদের দখলে রাখা জমির কিছু অংশে এঁরা ভূমিদাসদের বসাতেন আর বাকিটা থাকত তাদের খাস জমি।

জমির বিলি ও মালিকানার ভিত্তিতে প্রত্যেক সামন্তের মধ্যে দুটি সম্পর্ক গড়ে উঠত—একটি হচ্ছে সামন্তদের সঙ্গে উচ্চতর সামন্তদের ও রাজার সম্পর্ক এবং আর একটি হচ্ছে সামন্তদের সঙ্গে এঁদের অধীন ভূমিদাসদের সম্পর্ক।

সামন্তদের জীবনযাত্রা: জীবিকা অর্জনের জন্য সামন্তদের কোন কাজ করতে হত না। সে ব্যবস্থা তাঁদের আধীন কৃষক বা শ্রমিকরাই করে দিত। কিন্তু তাই বলে সামন্তরা অলস জীবন যাপন করতেন না। তখন যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। তাই সামন্তদের নিজ নিজ প্রভুর অধীনে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে হত। এই শর্তেই তাঁরা

জমিজমা ভোগদখল করতেন। বস্তুত, সামন্তদের দুর্গগুলিই মধ্যযুগে ইউরোপকে চরম বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেছিল।

সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধ করা। সেইজন্য ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেক সামন্তকে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে হত। প্রথমেই শিক্ষার্থীকে কোন এক যোদ্ধার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হত, যেখানে সে সর্বদা ঐ যোদ্ধার সঙ্গে থেকে ভৃত্যের মত কাজ করত ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করত। চৌদ্দ বছর বয়সে তার আসল শিক্ষা আরম্ভ হত। তখন তাকে বলা হত 'স্কোয়ার'। তখন সে ঢাল বহন করত ; কি করে ঘোড়ায় চড়তে হয়, কি করে বর্শা, তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়, এই সব শিখত। লেখাপড়ার দিকে বিশেষ কোন নজর দেওয়া হত না।

নাইট : 'স্কোয়ার' হিসাবে শিক্ষা শেষ হলে রাজা বা সম্মানিত
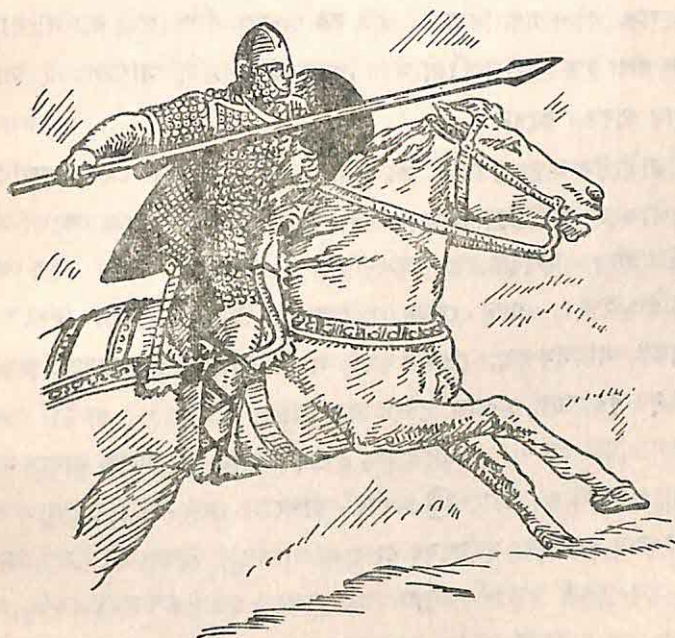
মধ্যযুগের নাইট

সামন্ত তাঁকে নাইট বা বীর পদবী দিতেন। 'নাইট' হতে হলে

কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করতে হত। নাইট পদপ্রার্থী যুবক অনুষ্ঠানের আগের দিন উপবাসী থাকতেন এবং স্নান করে সন্ধ্যাবেলা উপাসনা করতেন। পরদিন সকাল বেলায় গীর্জায় গিয়ে নাইটের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ শুনতেন। তারপর দীক্ষাদাতা তাঁকে অস্ত্র-শস্ত্রে ও নাইটের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করে তাঁর কাঁধে তরবারি স্পর্শ করে বলতেন, 'ঈশ্বরের নামে, সেণ্ট মাইকেলের নামে ও সেণ্ট জর্জের নামে আমি তোমাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলাম। তুমি বীর, সাহসী ও প্রভুভক্ত নাইট হও।' তারপর নাইট ঘোড়ায় চড়ে নানারকম ভাবে যুদ্ধ করার কৌশল দেখাতেন।

মধ্যযুগের নাইটদের কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল। তাঁরা প্রভুভক্ত, নম্র ও প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপর ছিলেন। অত্যাচারিত মানুষের জন্য স্বার্থত্যাগ, নারী ও শিশুকে রক্ষা ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন প্রভৃতি তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। এই সব গুণকে সিভালরী বা বীরোচিত কাজ বলা হত। শার্লামানের পিতামহ চার্লস মার্টেল এই নাইট প্রথার প্রবর্তন করেন।

নাইটের অস্ত্রশস্ত্র ছিল তরবারি, কুঠার, ঢাল ও বর্ম। যুদ্ধবিগ্রহ না থাকলে নাইটরা শিকার এবং টুর্নামেণ্ট বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে সময় কাটাতেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ হত দুজন বা দুদল নাইটের মধ্যে। বহু লোক নিমন্ত্রিত হত। এখন যেমন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা দেখতে বহু দর্শকের সমাগম হয়, তেমনি সেই সময় নাইটদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার জন্য দূর দূর শহর ও গ্রাম থেকে বহু মানুষ আসত। একটা প্রশস্ত জায়গা ঘেরা হত। সেখানে যুদ্ধ হত। তার চারদিকে থাকত নানা রঙের পতাকা ও ট্যাপেস্ট্রি অর্থাৎ কাপড়ের ওপর সূঁচের কাজ করা নানারকম দৃশ্য এবং দর্শকদের বসবার জায়গা। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের সকলকেই কতগুলি নিয়ম মেনে চলতে হত। সে সময় কেউ কোন ধারল অস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন না। নাইটরা দুদলে ভাগ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দুদিকে ঘোড়ায় চড়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। তারপর তূর্যনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করতেন।

যে নাইট প্রতিপক্ষকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতে পারতেন বা বর্শা ভেঙে দিতে পারতেন তাঁকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হত। বিজয়ী নাইটদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী বীরত্ব দেখাতেন, তিনি পুরস্কার বিতরণের জন্য অভিজাত বংশের একজন সুন্দরী মহিলাকে নির্বাচন করতে পারতেন।

সামরিক সংগঠন: আত্মরক্ষার তাগিদেই ইউরোপে সামন্ত প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কোন না কোন সামন্ত প্রভুর অধীনে ছিল। সামন্ত প্রভুর সৈন্যবাহিনীতে প্রজাদের যোগ দিতে হত। যখনই যুদ্ধ শুরু হত, রাজা সামন্তদের সৈন্য নিয়ে হাজির হতে বলতেন। রাজার নিজস্ব কোন বাহিনী থাকত না। লর্ড, নাইট এবং সাধারণ সৈনিকদের নিয়ে রাজার সৈন্য-বাহিনী গঠিত হত। লর্ড এবং নাইট ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা ও তর-বারি নিয়ে যুদ্ধ করতেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসতেন নিজেদের ঘোড়া এবং অস্ত্র। নাইটরা আপাদমস্তক লোহার তৈরী বর্মে আবৃত হয়ে থাকতেন।

সাধারণ সৈনিকরা দক্ষ ছিল না। কারণ তাদের সুশিক্ষিত করা হত না। সামন্তদের পার্থক্য অনুযায়ী সৈন্যদেরও শিক্ষাগত পার্থক্য ছিল। ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দেখাতেই নাইটরা আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা ছিল না। এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও নাইট এবং বড় জমিদাররা তাঁদের অধীন প্রজাদের জীবনরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। সুতরাং, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি মোটামুটি নিরাপদ ছিল।

ট্রবাডর: মধ্যযুগে 'ট্রবাডর' নামে পরিচিত একদল চারণ কবির আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা দেশীয় ভাষায় গান রচনা করতেন। মানুষ সহজেই তাঁদের গানের অর্থ বুঝতে পারত। তাঁরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতেন গান গাইবার জন্য। এই চারণ কবিরা ছিলেন পেশাদার। এঁদের মধ্যে অনেক অভিজাত ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকও ছিলেন। বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী নিয়ে ট্রবাডর-রা

গান রচনা করতেন। আর এই কবিতা গান ও আবৃত্তি করার জন্য তাঁরা অনেক সময় গায়ক ও চারণ কবিদের নিয়ে আসতেন। রাজা বা সামন্ত প্রভুর সামনে তাঁরা গান গাইতেন। তাঁদের কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল নাইটদের বীরত্বগাঁথা। এঁদের কবিতাগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল। সাধারণ মানুষের মুখেও এঁদের রচিত গান শোনা যেত। আজকের দিনের জনপ্রিয় গানের মতই সেই গানগুলিও মানুষের খুব প্রিয় ছিল।

ম্যানর হাউস ঃ সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত গ্রামগুলিকে
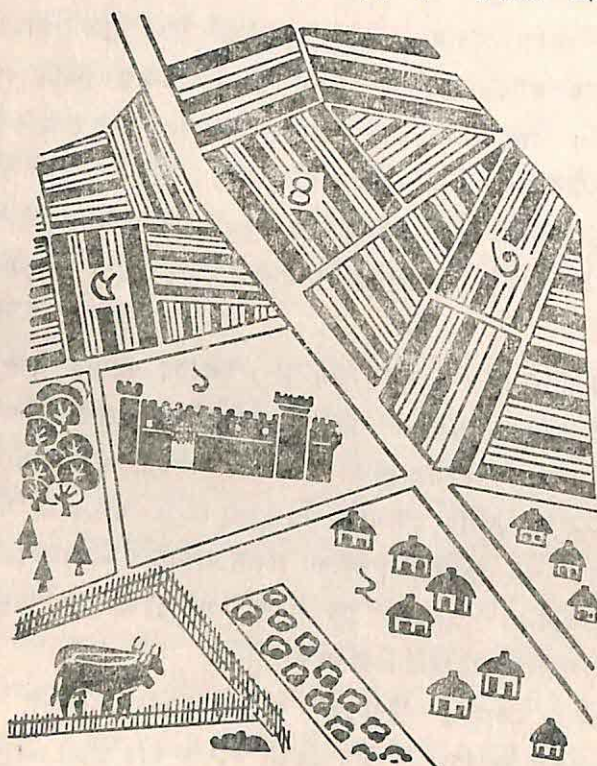
(১) জমিদার প্রাসাদ, (২) ভূমিদাসদের কুটির, (৩) শীতকালীন চাষের জমি, (৪) পতিত জমি, (৫) বসন্তকালীন চাষের জমি।

বলা হত ম্যানর। ম্যানরের মাঝখানে থাকত সামন্ত বা জমিদারদের প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদকে বলা হত 'ম্যানর হাউস'। কৃষি ও শিল্পের

দিক থেকে ম্যানরগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। মানুষের প্রয়োজনের প্রায় সব জিনিসই ম্যানরে উৎপন্ন হত। একজন মালিকের একাধিক ম্যানর থাকত। ম্যানরগুলিতে ম্যানরের মালিকের পরিবারেরা পালা করে বাস করতেন। এক ম্যানরের শস্যাদি শেষ হয়ে গেলে, তাঁরা অন্য ম্যানরে যেতেন। ম্যানর হাউসে একটি খুব বড় খাবার ঘর ও কয়েকটি শোবার ঘর থাকত; আর বাইরের উঠানে থাকত আস্তাবল, রুটি তৈরী করবার ঘর, গোলাঘর এবং চাকর-বাকরদের থাকবার ঘর।

কোন কোন জমিদার ক্যাসল্ বা সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন। শত্রুর গতিবিধি যাতে সহজেই লক্ষ্য করা যায় সেইজন্য এই দুর্গগুলি পাহাড় বা মাটির টিলার ওপর তৈরী করা হত। দুর্গের চারদিকে থাকত পাথরের তৈরী উঁচু প্রাচীর। প্রাসাদের বাইরে গভীর পরিখা,
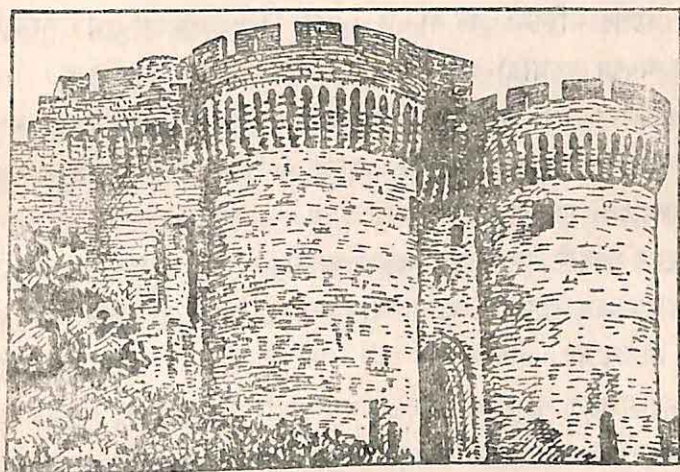
মধ্যযুগের দুর্গ

যাতায়াতের জন্য পরিখার ওপর সেতু এবং প্রবেশ দ্বারে লোহার শিক দেওয়া দরজা থাকত। শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করলে সেতুটিকে টেনে তুলে রাখা হত। এছাড়া দুর্গের চারদিকে সরু সরু লম্বা জানালা

থাকত। সেগুলির আড়াল থেকে দুর্গের অধিবাসীরা শত্রুর দিকে তীর ছুঁড়ত।

সামন্তজীবন: সামন্তদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল। বড় সামন্ত যখন ছোট সামন্তকে জমি দান করতেন, তখন সেই দানের বিনিময়ে ছোট সামন্তের কাছ থেকে পেতেন আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার। দুজনেই তখন পরস্পরের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য পালন করবার চেষ্টা করতেন। বড় মালিকের কর্তব্য ছিল ছোট মালিককে রক্ষা করা, তাঁর প্রতি সুবিচার করা এবং ন্যায্যভাবে তাঁকে তাঁর সম্পত্তি ভোগ করতে দেওয়া। অপরপক্ষে ছোট মালিকের কর্তব্য ছিল প্রভুকে আপদে-বিপদে সাহায্য করা, প্রভুর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য মজুত রাখা এবং তাঁর অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া। বড় সামন্ত যদি শত্রুর হাতে বন্দী হতেন, তাহলে ছোট সামন্তর কর্তব্য ছিল অর্থ দিয়ে প্রভুকে উদ্ধার করা। বড় সামন্তদের বড় ছেলের নাইট হওয়া বা বড় মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ছোট সামন্তের নিজ অবস্থা অনুযায়ী কর দেওয়াও আবশ্যিক বলে গণ্য হত। সেই সময় নানারকম সেলামী দেবার প্রথাও ছিল। এই দেওয়া-নেওয়া সব স্তরের সামন্তের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং সামন্তদের এই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল আইন সিদ্ধ। কিন্তু সামন্তদের সঙ্গে ভূমিদাসদের সম্পর্ক ছিল নিছক প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক; শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের মধ্যে কোন সম্মান, গৌরব বা মর্যাদা ছিল না।

সামন্তদের জীবনযাত্রা বড় বিচিত্র ছিল। তাঁরা নিজেদের ম্যানরগুলিতে বাস করতেন। ম্যানরগুলি ছিল একটা গ্রামের মত। ভূমিদাসরাই সেখানকার প্রধান অধিবাসী। গ্রামের মাঝখানে থাকত প্রভুর প্রাসাদ। প্রাসাদটি দিয়ে ঘেরা থাকত উঁচু পাঁচিল। প্রাসাদগুলি সাধারণত পাথরের তৈরী ও খুব জমকালো চেহারার হত। ভেতরে থাকত কয়েকখানা শোবার ঘর ও মাঝখানে একটা বিরাট হল। বাড়ীর ভেতরের ঘরগুলি এমন অন্ধকার থাকত যে দিনের বেলায়ও মশাল জ্বালিয়ে রাখতে হত। শীতের জন্য ঘরে

আগুন রাখলে ঘর ধোঁয়ায় ভরে যেত, কারণ ধোঁয়া বেরুবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ঘরের দেওয়ালে নানারকম নক্সা করা সুন্দর ও মনোরম পর্দা থাকত। আসবাবপত্র খুব একটা থাকত না। অবশ্য কোন কোন প্রাসাদে কিছু সুন্দর, সুদৃশ্য আসবাবপত্র থাকত। জমিদাররা প্রায়ই বিরাট ভোজ দিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতেন। তখন বড় বড় শুয়োর বা ষাঁড় আগুনে ঝলসিয়ে খাবার টেবিলে রাখা হত। ইটালী ছাড়া অন্য কোথাও তখন কাঁটা চামচের ব্যবহার ছিল না, তাই সকলেই খেতে বসে নিজের ছোরা দিয়ে মাংস কেটে তুলে নিতেন। জমিদাররা বহু বাজীকর, ভাঁড় এবং চারণ কবি বাড়ীতে রাখতেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তারা নানারকম খেলা দেখিয়ে এবং গান বাজনা ও গল্প করে সকলকে আনন্দ দিত।

সামন্তরা পশমের মোটা পোশাক পরতেন। আপেল, চেরী, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এবং পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, শসা, গাজর প্রভৃতি সব্জি সামন্তরা খেতেন। মাছ-মাংসও খুব পাওয়া যেত। শুয়োর, ষাঁড় ও হরিণের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম পাখীও প্রায়ই রান্না করা হত। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে শিকারই ছিল সামন্তদের সবচেয়ে প্রিয়। নানারকম অস্ত্র চালনার প্রতিযোগিতা হত। তীর ছোঁড়া একই সঙ্গে প্রমোদ ও প্রয়োজনীয় কাজ বলে গণ্য হত। সেকালে জমিদাররা লেখাপড়ার ধার ধারতেন না। অনেকে নিজের নাম পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে জানতেন না।

ভূমিদাস-শ্রেণী : সামন্ত সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ভূমিদাসরা। তারা সার্ফ ও ভিলিন নামে পরিচিত ছিল। ঐ সময়ে স্বাধীন কৃষকও ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল একেবারে কম। মধ্যযুগীয় সমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভূমিদাসরা। তারা চাষ করত, খাদ্য উৎপাদন করত এবং সমাজকে বাঁচিয়ে রাখত। কিন্তু জমির আসল মালিক ছিলেন সামন্ত প্রভুরা। মধ্যযুগে বলা হত, জমি ছাড়া প্রভু নেই, প্রভু ছাড়া জমি নেই।

রোম সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসরা ছিল মজুর বা শ্রমিক। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে আগের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সমাজে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। তখন মালিক শ্রেণী খাদ্যোৎপাদন ও অন্যান্য কাজ করবার জন্য ক্রীতদাসদের এক এক টুকরো জমি বিলি বন্দোবস্ত করে দিতেন। এই বন্দোবস্তের ফলে জমির ওপর চাষীর অধিকার কিছুটা স্বীকৃত হল। কিন্তু তা হলেও মালিক ইচ্ছা করলেই তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিতে পারতেন। এই অনিশ্চিত মালিকানাই ক্রমে স্পষ্ট, বাঁধাধরা ও ব্যাপক হয় এবং ক্রীতদাসরা ভূমিদাস-শ্রেণীতে পরিণত হয়। ঋণগ্রস্ত হয়েও বহু স্বাধীন কৃষক আস্তে আস্তে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। ম্যানরের মালিকরা কতকগুলি বিশেষ কাজ করা ও নির্দিষ্ট পাওনার প্রতিশ্রুতিতে ভূমিদাসদের ফালি ফালি জমি বন্দোবস্ত করে দিতেন। ভূমিদাসরা যদি মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করত বা মালিকের পাওনা না মেটাত, তাহলে মালিক তাদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিতেন। তার ফলে ম্যানর অর্থাৎ গ্রামের বাসভূমিও তাকে হারাতে হত। এইসব প্রতিশ্রুতি কিন্তু ছিল একতরফা। অর্থাৎ মালিকরা ভূমিদাসদের জন্য কিছু করবার প্রতিশ্রুতি দিতেন না। তবে রোমান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসদের থেকে ভূমিদাসদের অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল। কেননা, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারলে তাদের জমির অধিকার বজায় থাকত। প্রভু তাঁর জমি বিক্রি করলে ভূমিদাসও জমির সঙ্গে বিক্রি হয়ে যেত অর্থাৎ ভূমিদাসদের অন্য এক নতুন প্রভুর অধীন হতে হত। প্রতিশ্রুতি মত কাজ করলে ভূমিদাস পরিবার নিয়ে এক জায়গায় বাস করতে পারত।

ভূমিদাসদের কাছে জমির মালিকের অনেক চাহিদা ছিল। মালিকরা তাদের কাছ থেকে কর পেতেন। মালিকদের খাস জমিতে সপ্তাহে দু তিন দিন বেগার খাটতে হত। বেগার খাটা ছিল বাধ্যতা-মূলক। ভূমিদাসরা ইচ্ছামত জমি ছেড়ে দিতে পারত না। তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে যদি অন্য কোন ম্যানরের ভূমিদাসদের পরিবারে

হত, তাহলে বিয়ের আগে ঐ ম্যানরের মালিকের অনুমতি নিতে হত। কোন ভূমিদাস মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে বিশেষ একটা কর দিয়ে জমির অধিকার পেতে হত। এছাড়া ভূমিদাসদের ওপর আরও বিভিন্ন শর্ত চাপান ছিল। পয়সা দিয়ে মালিকের উনোনে রুটি তৈরী করতে হত। মনিবের কলে গম ভাঙাতে হত এবং মনিবের মাড়াই-কলে আঙুর মাড়াই করে মদ তৈরী করতে হত। মালিকের আদালতেই তাদের বিচার হত এবং সামান্য অপরাধে তাদের বেশী জরিমানা দিতে হত। এই জরিমানার অর্থ মালিকের তহবিলে যেত। ভূমিদাসদের জমি নানা দিকে ছড়ান ছিল। নানা দিক ঘুরে ঘুরে সেগুলো চাষ করতে হত। যদিও প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জমি থাকত, তবু চাষের সময় সকলে যৌথভাবে জমি চাষ করত।

ভূমিদাসরা বাস করত খড়ের চালে ঢাকা ছোট ছোট কাঠের বাড়ীতে। বাড়ীতে সাধারণতঃ একটা, বড়জোর দুটো ঘর থাকত। ঘরে জানালার বালাই ছিল না। মেঝে মাটির হত আর ধোঁয়া বেরোবার জন্য চালে একটা ফোকর থাকত। বৃষ্টি হলে ঐ ফোকর দিয়ে জল পড়ে ঘর ভিজে যেত। আগুন লাগলে সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ঘরে আসবাবপত্র বলতে কিছুই থাকত না।

ভূমিদাসরা লেখাপড়া জানত না, তাই সন্ধ্যার পর তাদের আর কিছুই করার থাকত না। তাদের ঘরদোর ছিল খুবই নোংরা। ভূমিদাসদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল কয়েকটা শুয়োর, গরু, বলদ আর হয়ত একটা ঘোড়া। মানুষের চোখে তারা গরু-বলদের চেয়ে উচ্চ-স্তরের জীব ছিল না। শোনা যায়, ফরাসী দেশে একবার একটা ঘোড়ার দাম একজন চাষীর দামের চেয়ে বেশী উঠেছিল। ভূমিদাসদের পরিবারে মেয়েদেরও সমান পরিশ্রম করতে হত। মেয়েরা ঘরের কাজ এবং ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করত। এছাড়া সুতো কাটা, কাপড় বোনা আর চাষের কাজে কিছু কিছু সাহায্য করাও ছিল তাদের নিয়মিত কাজ।

মাংস বা ভাল খাবার ভূমিদাসদের বড় একটা জুটত না। মোটা আটার লাল রুটি, পচাই মদ, শাক-সবজি, ডিম এই সব ছিল তাদের খাদ্য। সাদা রুটি ও মুরগীর মাংস খাওয়া তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। চামড়ার পোশাকেরই প্রচলন ছিল বেশী, অবশ্য পশমের পোশাকও তারা মাঝে মধ্যে পরত। যদি কোন সময়ে সামান্য মাংস তারা যোগাড় করতে পারত তবে তা শীতকালে খাবার জন্য নুন মাখিয়ে তুলে রেখে দিত।

আমোদ-প্রমোদের কোন সুযোগ তাদের ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি চলত। গ্রামের গীর্জাটি ছিল ভূমিদাসদের আনন্দের একমাত্র জায়গা। কুস্তির দিন সকলে জমা হত সেখানে। গীর্জাতে নানারকম নাচ-গান ও আমোদ-প্রমোদ চলত। রবিবার ছিল ভূমিদাসদের ছুটির দিন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে তারা গীর্জায় যেত। দল বেঁধে গীর্জায় প্রার্থনা করতে যাওয়া আর তারপর গল্প করতে করতে ঘরে ফেরাই ছিল তাদের নিরানন্দ জীবনে যা কিছু আনন্দ।

ম্যানরবাসীদের ব্যবহারের জন্য যে সব জিনিষপত্র এবং যন্ত্রপাতি দরকার হত তা ম্যানরেই তৈরি হত। এজন্য চাষী ছাড়া কামার, কুমোর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কারিগর মানরে থাকত। ফলে, প্রত্যেক ম্যানরেই একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে উঠেছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে ম্যানরবাসীদের বড় একটা সম্পর্ক থাকত না।

গীর্জার পুরোহিতের মুখের কথা শুনে ম্যানরবাসীরা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন। যারা রবিবার গীর্জায় যায় না এবং মিথ্যা কথা বলে তারা মহাপাপী, মৃত্যুর পরে এদের নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ম্যানরবাসীরা আরও বিশ্বাস করত যে রোমের পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁর কথা অমান্য করা অপরাধ। পোপের নাম করে পুরোহিতরা ম্যানরবাসীদের কাছ থেকে তাদের আয়ের এক দশমাংশ আদায় করতেন।

ম্যানরের চারদিকে জঙ্গল থাকত। জঙ্গলে রাখালরা শুয়োর চরাত, কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটত আর জমিদার ও তাঁর ছেলেমেয়েরা পাখী ধরত কিংবা শিকার করত।

শ্রেণী বিভাগ: সামন্তযুগের সমাজ ছিল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পুরোহিত শ্রেণী, জমিদার শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রেণী। কৃষক সম্প্রদায় ছিল সাধারণ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। সামন্তরা বা ম্যানরের মালিকরা ভূমিদাসদের শোষণ করতেন বলে সামন্তদের সঙ্গে চাষীদের সম্পর্ক ছিল শোষক ও শোষিতের। দিনের পর দিন হাড় ভাঙা খাটুনি সহ্য করতে পারত না বলে ভূমিদাসরা এই শোষণের হাত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজত। পরে তারা নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। চাষবাস ছেড়ে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য শহরের ব্যবসা ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করল। অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা বিদ্রোহীও হয়ে উঠেছিল।

অষ্টম অধ্যায়
ক্রুসেড

ক্রুসেডের কারণ: তোমাদের জানতে ইচ্ছা করে না, ক্রুসেড কথাটির অর্থ কি? এর অর্থ হল 'ক্রুশ চিহ্নিত'। শব্দটি স্প্যানিশ। এসব জানতে হলে প্রথমেই জেরুজালেমের কথা বলতে হয়। জেরুজালেম হল যীশুর জন্মভূমি, কর্মক্ষেত্র। জায়গাটা প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত। যীশুর সমাধিক্ষেত্রও এখানেই। তাই, ঐ জায়গা খ্রীষ্টানদের কাছে এক পবিত্র তীর্থভূমি। মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার নামই ক্রুসেড বা খ্রীষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ। এই ধর্মযোদ্ধারা তাঁদের পতাকা এবং পোশাক ক্রুশ চিহ্নিত করতেন, কারণ যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন।

ইসলামের অভ্যুত্থানের পর সপ্তম শতাব্দীতে খ্রীষ্টানদের পুণ্যতীর্থ জেরুজালেম আরব জাতির অধিকারে আসে। আরবের মুসলমানরা যীশুখ্রীষ্টকে তাদের একজন পয়গম্বর মনে করে ভক্তি করত। সুতরাং, তারা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেমে আসতে বাধা দিত না। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কীরা আরবদের হাত থেকে সিরিয়া জয় করে নেয়। তারা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেমে আসতে বাধা দিতে লাগল এবং অকারণে তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করতে লাগল। অত্যাচারিত তীর্থযাত্রীরা এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে রোমের পোপের কাছে অভিযোগ করল। পোপ দ্বিতীয় আর্বান ফ্রান্সের ক্লেরমণ্টে সমগ্র ইউরোপের খ্রীষ্টানদের এক সভা আহ্বান করে পুণ্যভূমি প্যালেস্টাইন উদ্ধার করার জন্য তাদের কাছে আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানের ফলে উইরোপের সর্বত্র এক আশ্চর্য উদ্দীপনা দেখা দিল। ইউরোপের রাজারা, অভিজাত সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ জেরুজালেম উদ্ধার করে সেখানে একটি খ্রীষ্টান রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

পিটার বক্তৃতা করছেন

গল্প আছে, খ্রীষ্টানদের দুরবস্থার কথা জানতে পেরে পিটার নামে একজন সাধু চটের কাপড় পরে ক্রুশ হাতে, খালি পায়ে, গাধার পিঠে চড়ে রাইন নদীর তীরে দুপাশের শহরে এবং গ্রামে ঘুরে বেড়াতে থাকেন আর মুসলমানের হাত

থেকে পবিত্র তীর্থভূমি জেরুজালেম রক্ষা করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

অনেক বছর ধরে, প্রায় দুশো বছর (১০৪৯—১২৯১ খ্রীঃ), এই ধর্মযুদ্ধ চলেছিল। মোট সাতটি ক্রুসেড হয়েছিল।

প্রথম ক্রুসেডঃ রাজারা সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার আগেই পিটারের নেতৃত্বে কয়েক লক্ষ ধর্মান্ধ নরনারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। এই দলে অনেক চোর ডাকাতও যোগ দিয়েছিল। এদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে হাঙ্গেরীর অধিবাসীরা এই দলকে আক্রমণ করল এবং কয়েক হাজার লোককে হত্যা করল। অবশিষ্ট লোকজন এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হওয়া মাত্র মুসলমানদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট অভিযান প্যালেস্টাইন অভিমুখে যাত্রা করল। ইউরোপের রাজারা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি, কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের বহু ভাগ্যান্বেষী যুবক এই যুদ্ধে যোগদান করেছিল। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান বাহিনী জেরুজালেম অধিকার করল। তারপর গডফ্রে নামে একজন নর্মান নাইট জেরুজালেমের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন।

কিছুদিন জেরুজালেমে অবস্থান করার পর খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। আস্তে আস্তে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা দেখা দিল ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ল্যাটিন অভিজাত সম্প্রদায় মুসলমানদের কাজে নিযুক্ত করল। পশ্চিমের মানুষ প্রাচ্যের জীবনযাপন প্রণালী এবং বিজ্ঞান, ওষুধ, খাবার ইত্যাদি গ্রহণ করল। ইটালীর অধিবাসীরা মুসলমানদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করল।

জেরুজালেমে খ্রীষ্টান রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর এখানে দুটি ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করা হয়। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের একদল একটি সংঘ স্থাপন করল। এর নাম হয় সেণ্টজনের নাইটদের সংঘ। সেণ্টজনের হাসপাতাল গৃহটি ছিল এই সংঘের কেন্দ্র।

অন্য একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করেছিল আর একদল নাইট। ইহুদি রাজা সলোমনের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত একটি বাড়ীতে এঁরা বাস করতেন। এই ভ্রাতৃসংঘের নাম ছিল মন্দিরের নাইটসংঘ বা 'নাইট টেম্পলারস'। পীড়িত ও আহত ক্রুসেডারদের সেবা, খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, ধর্মস্থান রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মের জন্য সর্বস্ব পণ করে বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ—এই ছিল ভ্রাতৃসংঘের প্রধান কাজ।

তৃতীয় ক্রুসেড : ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের সুলতান সালাদিন খ্রীষ্টানদের অধিকার থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন।

জেরুজালেমের পতনের সংবাদে শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেড। এই পতনে সমস্ত ইউরোপ খুবই ক্ষুব্ধ হল। খ্রীষ্টান রাজারা ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ইংলণ্ডেররাজা 'সিংহপ্রাণ' রিচার্ড, ক্রুসেডের জন্য প্রজাদের কাছে স্বায়ত্ব-শাসনের সনন্দ বিক্রি করে প্রচুর অর্থ অংগ্রহ করলেন। রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাস এবং জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা প্রত্যেকে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য রওনা হলেন। কিন্তু তৃতীয় ক্রুসেডে কোন ফল হল না। খ্রীষ্টান রাজাদের মধ্যে একতা ছিল না। রিচার্ড খুব সাহসী ও সুনিপুণ যোদ্ধা হলেও সমর কুশল সেনাপতি ছিলেন না। তা ছাড়া অতি সামান্য কারণেই ধৈর্য হারিয়ে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিতেন। ফরাসী রাজা ফিলিপ তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

রিচার্ড অর্থ সংগ্রহ করছেন

এর আগেই ফ্রেডারিকের মৃত্যু হয়েছিল। রিচার্ড একা কিছুকাল সালাদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবশেষে সন্ধি করলেন। খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেমে তীর্থ করতে পারবে এবং তাদের ওপর কোন উৎপীড়ন করা হবে না, এই ব্যবস্থা করে রিচার্ড দেশে ফিরে গেলেন।

চতুর্থ ক্রুসেড ঃ চতুর্থ ক্রুসেডকে ঠিক ক্রুসেড না বলে বাণিজ্যিক অভিযান বলা যায়। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে একদল উৎসাহী খ্রীষ্টান ভেনিসে সমবেত হয়েছিল। ভেনিসবাসীরা তাদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী এড্রিয়াটিক নদীর তীরে জারা শহর আক্রমণ করতে ধর্ম-যোদ্ধাদের উৎসাহিত করল। এর পর ধর্মযোদ্ধারা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করল, শহরে আগুন ধরিয়ে দিল। বহু মূল্যবান জিনিস নষ্ট হল। এই ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্যে ল্যাটিন সাম্রাজ্য স্থাপিত হল, আর ভেনিস পেল বাণিজ্যিক সুবিধা।

ক্রুসেডের বিখ্যাত যোদ্ধা ঃ ক্রুসেডের বীর যোদ্ধাদের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাস, জার্মানির বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা, বুদ্ধিমান দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এবং মুসলিম পক্ষে মহান হৃদয় সালাদিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সালাদিন (১১৬৯-১১৯৩খ্রীঃ) প্রথম ক্রুসেডের সত্তর বছর পরে মিশরে সালাদিন নামে এক বীর যোদ্ধার আবির্ভাব হয়। সালাদিন ছিলেন জন্মে কুর্দীস্থানী, ধর্মে মুসলিম, শৌর্যে অপরাজেয় ও চরিত্রে মহান। তিনি ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করেন। জেরুজালেমের যুদ্ধে যাট হাজার খ্রীষ্টান পুরুষ, নারী ও শিশু বন্দী হয়েছিল।

খ্রীষ্টান বীর রিচার্ড, ফিলিপ এবং বার্বারোসা ঃ রিচার্ড ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা। ক্রুসেডে যোগদানের সময় তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী বীর ও যোদ্ধা। তিনি ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের সঙ্গে ক্রুসেডে যোগ দেন। বার্বারোসা সাতষট্টি বছর বয়সে ধর্মের নামে উৎসাহের আতিশয্যে গালিপোলিতে উপস্থিত হন।

যাবার পথে নদী পার হবার সময় তিনি জলে ডুবে মারা যান। রিচার্ড জেরুজালেমের কাছে আক্কার জয় করেন। একদিন তিনি জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বরের বিকারে তিনি জল, ফল, ওষুধ বলে চিৎকার করতে থাকেন। সালাদিন সেই কথা জানতে পেরে তাঁর চিকিৎসককে বরফ, পিচফল, আতাফল, আপেল ও ওষুধ দিয়ে শত্রুর শিবিরে পাঠান। সালাদিনের এই মহান ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে রিচার্ড সন্ধি করেন।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিকঃ ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বুদ্ধিমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হন। অবশ্য পোপের সঙ্গে ফ্রেডারিকের সদ্ভাব ছিল না। ফ্রেডারিক ছিলেন গুণী ও জ্ঞানী। তিনি আরবী ভাষা জানতেন। তিনি যুদ্ধ না করে মুসলিম সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। ইসলামের খলিফা আল কামিল খ্রীষ্টান রাজার আরবী ভাষায় জ্ঞান দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বিনা যুদ্ধে খ্রীষ্টানদের হাতে যীশুর মাতৃভূমি নেজারথ, জন্মভূমি বেথেলহেম এবং সমাধিক্ষেত্র জেরুজালেম অর্পণ করলেন। খ্রীষ্টানরা দুশো বছর ধরে যে দেশ জয় করতে পারেননি, ফ্রেডারিক বিনাযুদ্ধে তা অধিকার করলেন। অবশ্য ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানরা আবার জেরুজালেম অধিকার করে। এর পর ইউরোপে আর কোন বড় ক্রুসেড হয়নি।

ক্রুসেডের ফলঃ প্রায় দুশো বছর জেরুজালেমের অন্তর্গত আক্কারের দুর্গে বহু খ্রীষ্টান বাস করেছিল। ফলে খ্রীষ্টানদের ওপর আরবদের জীবনযাত্রার অনেক প্রভাব পড়ল। ইউরোপের ভাষায় প্রায় এক হাজার আরবী শব্দ প্রবেশ করল। অনেকের মতে এনামেল, কাঁচ, বারুদ, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ও মুদ্রণ-শিল্প আরবদের অনুকরণে ইউরোপে প্রচলিত হয়েছে। বহুবার যাতায়াতের ফলে ইউরোপের লোক অনেক নতুন নতুন দেশ দেখল। তারা নতুন পথ চিনল, জলে-স্থলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করল। তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমা অনেক বেড়ে গেল। ইহুদি এবং

মুসলিম চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে তারা অনেক নতুন জ্ঞান লাভ করল। ক্রুসেডের সঙ্গে সঙ্গে বহু বণিক প্যালেস্টাইনে এসেছিল। আরব দেশ থেকে তারা রেশম, চিনি, মসলা, বিশেষত লঙ্কা, আদা, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, সরষে এবং ভুট্টা ইউরোপে আমদানি করল। ফলের মধ্যে লেবু, তরমুজ, পিচ এবং খেজুর ইউরোপে নতুন আমদানি হল। কাপড়ের মধ্যে সাটিন, মখমল, পর্দা, কম্বল এবং রঙিন কাপড় আরবের দান। বিলাস দ্রব্যের মধ্যে পাউডার, গন্ধদ্রব্য, মুক্তোর মালা এবং আয়নার ব্যবহার ইউরোপীয়রা আরবদের কাছে শিখেছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয়দের মনের প্রসার ঘটেছিল। মুসলমানদের কাছ থেকে তারা অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যাগুলি ও কাগজ তৈরির কৌশল শিখেছিল।

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারই ক্রুসেডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল। ক্রুসেডই বিবাদের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক মিলনের সেতু গড়ে তোলে। ক্রুসেডের ফলে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে কুটির শিল্পে বহু লোক নিয়োজিত হল।

নবম অধ্যায়
মধ্যযুগীয় শহর

ক্রুসেডের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে অনেক শহর গড়ে উঠল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর বর্বরদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের শহরগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই সময় অধিকাংশ লোকই বাস করত ম্যানরে বা গ্রামে। মধ্যযুগে এক শ্রেণীর শ্রমিকের উৎপত্তি হয়েছিল। তারা প্রাচীর ঘেরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছুতোরের কাজ, চামড়ার

কাজ, কাপড় বোনা, মাটির জিনিস তৈরী প্রভৃতি শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিল। ম্যানরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও
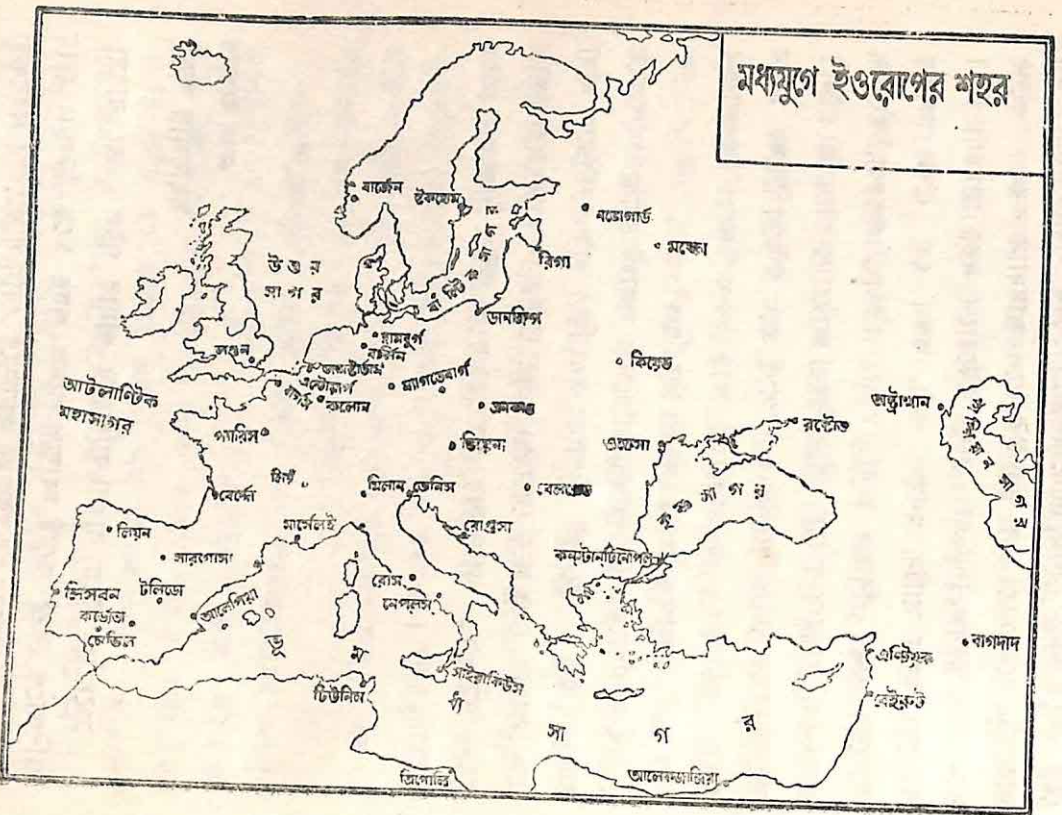
এদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ব্যবসায়ীরা নানা জিনিস আমদানি করে ঘুরে ঘুরে সামন্তদের কাছে বিক্রি করত। প্রয়োজন মনে করলে সামন্তরা নিজেদের এলাকায় খানিকটা জায়গা

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে এইসব কারিগর ও বণিকদের বাস করার অনুমতি দিত। ব্যবসায়ীদের বসবাসের ফলে জায়গাগুলি বেশ জনবহুল হয়ে উঠত। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাকে বলা হত বার্গ, আর সেখানকার লোকদের বলা হত বার্গার বা বার্জেনসিস। ঐ বার্গগুলিতে বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হল ও আস্তে আস্তে বাণিজের পুনর্জীবন ঘটল। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বুর্জোয়া নামে পরিচিত হল। এইভাবে মধ্যযুগীয় শহরের উদ্ভব হয়েছিল।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নানা কারণে, বিশেষত ধর্মযুদ্ধের ফলে শহরের সংখ্যা ও প্রাধান্য বেড়ে যায়। ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্যে যাতাযাত খুব বেশী চলতে থাকে এবং তারই ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব বেড়ে যায়। শহরবাসী বণিকরা ক্রমেই অর্থশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের ক্ষমতাও বেড়ে যায়। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, ভিয়েনা, লণ্ডন, ডাবলিন প্রভৃতি শহর ইউরোপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মধ্যযুগে বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহর প্রায়ই সমুদ্র বা নদীর তীরে গড়ে উঠত। কারণ, জলপথেই তখন ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী চলত।

নগরের রূপ ঃ বাইরের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য জমিদারদের দুর্গগুলির মত শহরগুলিও প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত। বাইরে থেকে দেখলে শহরগুলিকে সুন্দর বলে মনে হত। আসলে ভেতরটা ছিল অন্যরকম। পথগুলি ছিল সরু ও আঁকাবাঁকা। পথের দু'ধারে ছিল বড় বড় বাড়ী। সেজন্য দিনের বেলায় পথগুলি অন্ধকার হয়ে থাকত। রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। বাজার ছাড়া অন্য কোথাও একটুও খোলা জায়গা মিলত না। শহরগুলি ছিল ছোট, ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর। সমস্ত লণ্ডন শহরটির আয়তন এক বর্গ মাইলেরও কম ছিল। পুকুর ও কুয়োগুলি ছিল প্রায়ই দূষিত। শুয়োর এবং কুকুর রাস্তার ময়লা খেয়ে মেথরের কাজ করত। রোগমহামারী প্রায়ই লেগে থাকত।

প্রত্যেক শহরেই সপ্তাহে একদিন অথবা দুদিন হাট-বাজার বসত। বাজারে বিক্রির জন্য ঘোড়া, গরু, ভেড়া বা শস্য আনা হত।
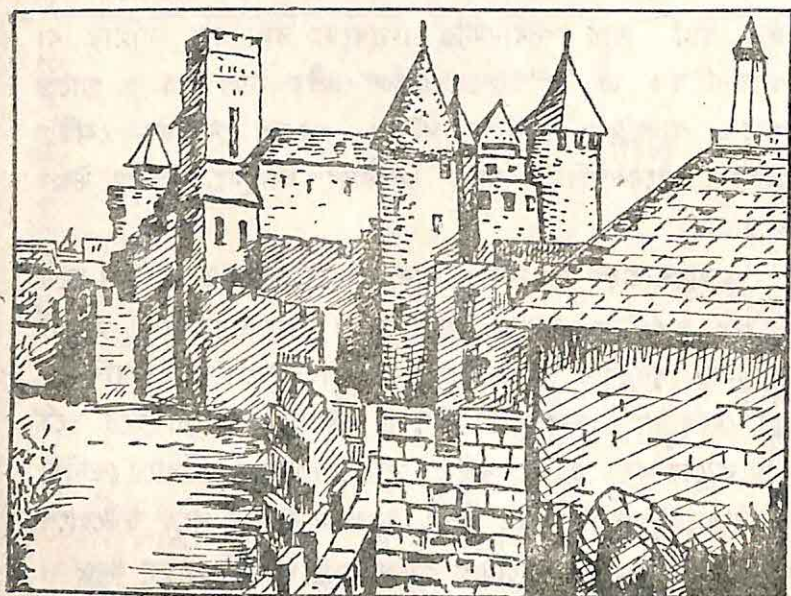
মধ্যযুগের নগর

এগুলি আনার জন্য কর দিতে হত। এসব হাট ছাড়াও অনেক শহরে, বছরে একদিন বা দুদিন মেলা বসত।

শহরের শাসনব্যবস্থাঃ শহরগুলি ছিল ছোট, লোকসংখ্যা সাধারণতঃ হাজার দশেকের মত বা তার চেয়েও কম হত। প্রভাবশালী বণিকেরা একটি সভা গঠন করতেন। মেয়র থাকতেন সেই সভার সভাপতি। তিনি সভার সদস্য অল্ডারম্যানদের সাহায্যে শহরের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। নাগরিক শাসনসভা ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েও হস্তক্ষেপ করত। এমনকি বিয়েতে কতজন লোক নিমন্ত্রিত হবে তাও নাগরিক সভা ঠিক করত। আবার কোন ব্যক্তি কি পোশাক কিনবে এবং পরবে, কে বাগানে কোন গাছ পুঁতবে সে সবও ঠিক করে দিত নাগরিক সভা। শান্তি রক্ষার জন্য

নাগরিক শাসনসভা মাঝে মাঝে রাতে পাহারার ব্যবস্থা করত, কারণ চুরি, ডাকাতি বা খুন জখম প্রায়ই লেগে থাকত।

মধ্যযুগের শেষদিকে শহরগুলি রাজা বা সামন্তদের কাছ থেকে নানারকম অধিকার লাভ করেছিল। সেই সব অধিকার একটি চার্টার বা সনদে লেখা থাকত—এতে নাগরিক কর বা করের পরিমাণ, পৌরসভার গঠন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় লেখা থাকত। ইটালির রোম, জার্মানির বার্লিন, ইংলণ্ডের লণ্ডন, ফ্রান্সের প্যারিস ও রীমজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নগরের শাসন ব্যবস্থায় রাজা ও সামন্তরা সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না। নাগরিকরা কখনও কখনও আইন প্রণয়ন করত, মুদ্রা প্রচলন করত এবং করের পরিমাণ ঠিক করত। বড় বড় সামন্তরা রাজার মতই শাসন করতেন।

বিভিন্ন শহরের বণিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য প্রতি শহরে একটি করে সমিতি গড়ে তুলত। এগুলিকে বলা হয় 'ট্রেড গিল্ড' বা বণিক সমিতি। ক্রমে শহরের আয়তন এবং লোকসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। তখন একটি মাত্র সমিতির পক্ষে সমস্ত শিল্পী ও শ্রমিকদের কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই প্রত্যেকটি শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক সমিতির সৃষ্টি হয়। এগুলিকে বলা হত 'ক্রাফট গিল্ড' বা শিল্প-সমিতি।

প্রত্যেক শিল্পীকে একজন প্রভু-শিল্পীর অধীনে সাত বছর কাজ করতে হত। তারপর তারা গুরুগৃহে পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করত। ক্রমে দক্ষতা অর্জন করে তারা নিজেরাই প্রভু-শিল্পী হতে পারত। সমিতি বৃদ্ধ, অশক্ত-শ্রমিক, দুস্থ-বিধবা ও শিশুদের নানারকম সাহায্য করত।

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে চীন

চীনের উন্নত প্রাচীন সভ্যতা মধ্যযুগে চীনকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। হান বংশের পতনের পর সুই বংশ যখন চীনে রাজত্ব করতে আরম্ভ করল তখন চীনের অরাজকতা ও অনৈক্য দূর হল। যদিও সুই বংশ মাত্র তিরিশ বছর রাজত্ব করেছিল, তবুও এই বংশের অধীনে চীনে শান্তি স্থাপিত হয় এবং ফরমোসা ও পশ্চিমে কিছু অঞ্চল চীন সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

পরবর্তী বংশ, তাঙ বংশের (৬১৮-৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকালে চীনে এক গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হয়। তাঙ বংশের রাজারা তিনশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই তিনশ বছরকে চীনের ইতিহাসের স্বুবর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগে চীন সাম্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে চীন বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাঙ সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে রাজত্ব করছিলেন। বাংলার পাল রাজারা তাঙ রাজাদের সমসাময়িক ছিলেন।

তাঙ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন তাঙ-তাই-সুং। তাঙ বংশ যখন প্রথম সিংহাসন অধিকার করে তখন চীন ছিল খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন এবং তাতার আক্রমণে বিব্রত। সম্রাট তাঙ-তাই-সুং তাতারদের চীন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি একে একে বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যগুলি জয় করে সমস্ত চীন জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঙ সাম্রাজ্যের মত এতবড় সাম্রাজ্য চীন এর আগে স্থাপিত হয়নি। পামির, মধ্য এশিয়ার এক বিস্তৃত অঞ্চল, ইন্দোচীনের একাংশ এবং কোরিয়া প্রভৃতি দেশ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঙ সাম্রাজ্যের রাজধানী চাঙ আন শহর ছিল আয়তনে বিরাট।

সমস্ত দেশের লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটির ওপর। লোক গণনার পদ্ধতি প্রথম চীন দেশেই শুরু হয়।

এই সময় চীন দেশের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশ বিদেশ থেকে বণিক, পর্যটক ও ধর্ম প্রচারকের দল চীনে আসত। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ তাঙ-তাই-সুং-য়ের কাছে কয়েকজন দূত পাঠিয়েছিলেন। এঁরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ক্যান্টন বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এঁদের আলোচনা হয়েছিল। এই সময়ে ক্যান্টনে একটি মসজিদ স্থাপিত হয় এবং চীনের বহু অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সময় খ্রীষ্টান ধর্মও চীনে প্রচারিত হয়। তাঙ বংশের রাজত্বকালে পারস্যের জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত ধর্মও চীনদেশে প্রচারিত হয়। চীনে এর আগেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল।

চীনের আর একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন মিং হুয়াং। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তিনি খুব দয়ালু রাজা ছিলেন। তাঁর সময় মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হয়। মিং হুয়াং-এর রাজত্বকালে চীনা সংস্কৃতির বিশেষ বিকাশ ঘটে।

তাঙ যুগে চীন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এই সময় ক্ষেতে জলসেচের সুব্যবস্থার জন্য বড় বড় খাল কাটা হয়। তাঙ যুগে তিয়েন সিন থেকে হান-চৌ পর্যন্ত ৬৫০ মাইল লম্বা একটি খাল কাটা হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে চীন এই সময় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। চীনের বণিকরা জাহাজে করে দূর দূরান্তে বাণিজ্য করতে যেত। যবদ্বীপ, সুমাত্রা মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। অন্যান্য দেশ থেকেও বণিকরা চীনে বাণিজ্য করতে আসত। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে রেশম, বস্ত্র, কাগজ, চীনা মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জের নানারকম জিনিস ইত্যাদি ছিল প্রধান। জ্ঞান-বিজ্ঞানেও চীন খুব উন্নতি করেছিল। কাগজ তৈরীর পদ্ধতি চীনারাই প্রথম আবিষ্কার করে। আরবরা এদের কাছ থেকে এই পদ্ধতি শিখে ইউরোপে প্রচার করে। বারুদের আবিষ্কারও চীনেই প্রথম হয়।

এই সময় চীনে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয়—একটি হল দিগদর্শন যন্ত্র বা কম্পাস এবং আর একটি হল বই ছাপাবার মুদ্রাযন্ত্র। কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নতির ফলে চীন দেশের অধিবাসীদের জীবন ধারা অনেক উন্নত হয়। পানীয় হিসাবে চায়ের ব্যবহার তাঙ যুগেই আরম্ভ হয়। এই সময় হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন এবং ভারত থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও চীনে যান।
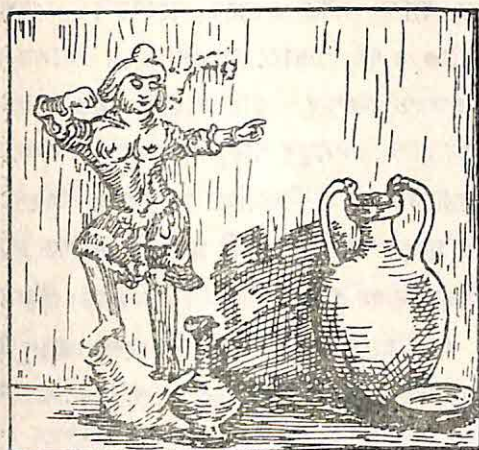
তাঙ যুগের মৃৎশিল্প

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনেও চীনারা খুব উন্নতি লাভ করে। গীতিকাব্য রচনায় চীনের কবিরা এ যুগে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন লী-পো। লী-পো মানুষটি ছিলেন অদ্ভুত স্বভাবের, একেবারে বদ্ধ মাতাল। কিন্তু মত্ত অবস্থায়ও তাঁর মুখ থেকে এত সুন্দর কবিতা বের হত যে লোকে তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত। লী-পো-র কবিতা শুনে তাঙ সম্রাট মিং হুয়াং তাঁকে সভাকবি করে নিয়েছিলেন। লী-পো তরবারি খেলাতেও খুব দক্ষ ছিলেন। তাঁর আশ্চর্য গুণ দেখে লোকে মনে করত, লী-পো নিশ্চয়ই স্বর্গের দূত, দেবতার শাপে পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

হান-লিন নগর ছিল শিক্ষার একটি বড় কেন্দ্র। এক সময় এখানে আট হাজার বিদ্যার্থী শিক্ষা পেত। এই যুগের প্রখ্যাত চিত্রকর ছিলেন উ-ইয়ু।

সম্রাট তাঙ-তাই-সুং এক উন্নত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। সীমান্ত রক্ষার জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রজার

মঙ্গল সাধনের জন্য সম্রাট অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। তিনি রাজসভার ব্যয় কমিয়েছিলেন ও শাসন বিভাগে বহু দোষ-ত্রুটির সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে যোগ্যতার পরীক্ষা করে রাজকার্যে কর্মচারী নিয়োগ করতেন।

চীনের এই শাসনপদ্ধতি আজও আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়।

হিউয়েন সাঙ ঃ হিউয়েন সাঙ ছিলেন চীন দেশের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তিনি চীন থেকে কাবুলের পথে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। গোবি মরুভূমির উত্তরদিক পার হয়ে তিনি ভারতে আসেন এবং দেশে ফিরবার পথে দক্ষিণদিকে পামীর মালভূমি পার হয়ে খাসগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান এবং লোপ-নো-র মধ্য দিয়ে যান। তাঁর যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। সাহস, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে বিপদজনক পথ অতিক্রম করে তিনি ভারতে পৌঁছান। সেই সময় চীন দেশে বিদেশভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। হিউয়েন সাঙ গোপনে চীন থেকে বের হয়ে গোবি মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

হিউয়েন সাঙ

৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিউয়েন সাঙ ভারতে ছিলেন। তিনি ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই প্রবেশ করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজ্যে তিনি অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। রাজমহলে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে হিউয়েন সাঙের প্রথম সাক্ষাৎ হলে হর্ষবর্ধন তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং সেখান থেকে কনৌজ এবং পরে

এলাহাবাদে নিয়ে যান। হিউয়েন সাঙ ছিলেন মহাযান মতের সমর্থক। তিনি বার খণ্ডে তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এতে তিনি
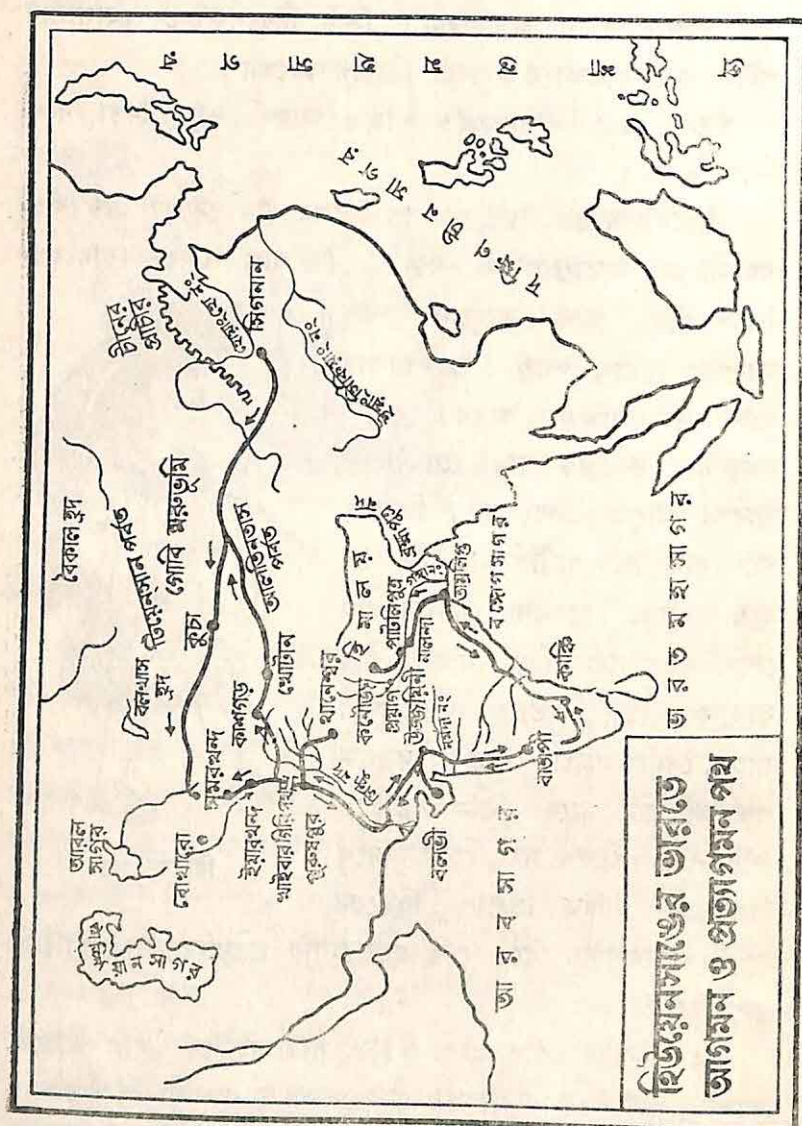
তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজচিত্র তাঁর লেখায় পাওয়া

যায়। হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরূপে যোগদান করেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও এক বিবরণ রেখে যান। দেশে ফেরবার সময় হর্ষবর্ধন তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দেন এবং যাত্রার সুবন্দোবস্ত করে দেন। ফেরবার পথেও তাঁকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৫০টি বুদ্ধের দেহের চিহ্ন, সোনা, রূপা ও চন্দকাঠের তৈরী বুদ্ধের অনেকগুলি মূর্তি এবং প্রায় ১৫০টি পাণ্ডুলিপি। এগুলি নিতে কুড়িটি ঘোড়ার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন এই বইগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করে। মৃত্যুর পূর্বে ৭৪টি বই-এর অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হিউয়েন সাঙ ভারতে আসার ফলে চীনের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। চীনে বৌদ্ধধর্ম আরও ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলির ব্যাখা চীনা ভাষায় অনূদিত হয়।

শুঙ বংশ (৯৬০—১২৪০ খ্রীঃ): শুঙ বংশের রাজত্বকাল সাহিত্য, দর্শন ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ওয়াঙ-আন-শি সামাজিক ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। শুঙ বংশের শাসন ভালভাবেই চলছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বর্বরদের আক্রমণে শাসকরা বিব্রত হলেন। আক্রমণকারীরা ছিল কিতান, চীন, তাতার এবং মোঙ্গল। মোঙ্গলদের বিখ্যাত নেতা ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা চেঙ্গিজ খাঁন ত্রয়োদশ শতব্দীর গোড়ার দিকে চীনের উত্তরাংশে অভিযান চালান। ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পীত নদীর উত্তরদিকের অধিকাংশ স্থান তাঁর অধীন হয়। সাময়িকভাবে মোঙ্গলদের সঙ্গে শুঙ রাজাদের সন্ধি হয়, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে শুঙ বংশের শেষ-সম্রাট চেঙ্গিজ খাঁনের দৌহিত্র কুবলাই খাঁনের হাতে চীনের সাম্রাজ্য অর্পণ করতে বাধ্য হন।

এই বংশের সময় উল্লেখযোগ্য কতগুলি সামাজিক পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল, কৃষকদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সম্পত্তির ওপর কর ধার্য করা হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ৮৫০ বছর আগে চীন দেশে সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার তাঙ বংশের সময় হলেও শুঙ বংশের সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি হয়েছিল। এই সময় রেশম শিল্পীরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল।

মোঙ্গলদের পরিচয়ঃ উত্তর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ে মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। হূণ ও তুর্কীদের মত মোঙ্গলরাও ছিল এক শক্তিশালী, সাহসী, যুদ্ধপ্রিয় ও যাযাবর জাতি। চীনের উত্তরে মঙ্গোলিয়ার মরুময় দেশে ছিল এদের বাসভূমি। এরা ঘোড়ায় চড়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত আর থাকত তাঁবু ফেলে। খেত মাংস আর ঘোড়ার দুধ বা সেই দুধের তৈরী খাবার। পশুপালন, শিকার আর যুদ্ধ করেই তাদের জীবন কাটত। এরা ঘোড়ার পিঠ থেকে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারত আর পারত দক্ষতার সঙ্গে তলোয়ার ও ছোরা চালাতে। সম্ভবত, এরা বারুদের ব্যবহার ওজানত। গ্রাম ও নগর পত্তন করে সেখানে বাস করা মোঙ্গলরা মোটেই পছন্দ করত না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এক একজন সর্দারের অধীনে বাস করত।

চেঙ্গিজ খানঃ মোঙ্গলরা প্রথমে ছিল দুর্বল ও পরাধীন। কিন্ নামে শক্তিশালী এক হূণ জাতি তাদের ওপর কর্তৃত্ব করত। মোঙ্গলরা এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চেঙ্গিজ খান এই উপজাতিগুলিকে নিজের বশে এনে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। চেঙ্গিজের জন্ম হয় ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। চীনা ভাষায় চেঙ্গিজ কথাটির অর্থ সার্থক যোদ্ধা। তাঁর নাম ছিল তেমুচিন। অল্প বয়সেই তাঁর বাবা

মারা যান। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নানা দেশ আক্রমণ করে তাদের সামরিক শক্তির পরিচয় দিতে থাকে।

১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিজ কিনদের হটিয়ে দিয়ে উত্তর চীনের পিকিং দখল করেন। উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করে চেঙ্গিজ পশ্চিমদিকে খোয়ারিজমের রাজা বা শাহের কাছে দূত পাঠান। কিন্তু নির্বোধ শাহ চেঙ্গিজকে স্বাধীন রাজা হিসাবে স্বীকার করলেন না। শুধু তাই নয়, চেঙ্গিজের দূতদের শাহ হত্যা করলেন। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য চেঙ্গিজ খোয়ারিজম আক্রমণ করলেন। চেঙ্গিজের সঙ্গে যুদ্ধে খোয়ারিজমের একলক্ষ ষাট হাজার সৈন্য নিহত হল। চেঙ্গিজ স্বয়ং বোখারা জয় করে তিরিশ হাজার শত্রু সৈন্য হত্যা করলেন এবং অনেক শহর লুঠ করলেন। এরপর তিনি সমরকন্দ ও বল্কান অধিকার করলেন। সমরকন্দের অধিবাসীরা চেঙ্গিজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চেঙ্গিজ শহরটি লুঠ করে সমস্ত নাগরিকদের হত্যা করতে আদেশ দেন। চেঙ্গিজের এক পুত্র তুলি খান খোরসানে সত্তর হাজার নর-নারীকে নিশ্চিহ্ন করলেন। মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র মার্ভ, রাই, নিশাপুর প্রভৃতি বিখ্যাত শহরের মসজিদ, গ্রন্থাগার, প্রাসাদ প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে গেল। খোয়ারিজমের শাহের পুত্র জালালউদ্দিনের পশ্চাৎ অনুসরণ করে চেঙ্গিজ সিন্ধু নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। জালালউদ্দিন চেঙ্গিজকে বাধা দিলেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে তিনি দিল্লীতে ইলতুতমিসের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। চেঙ্গিজ লাহোর পর্যন্ত জালালউদ্দিনকে অনুসরণ করলেন। ইলতুতমিস জালালউদ্দিনকে আশ্রয় না দিয়ে ভারতবর্ষকে মোঙ্গল বিভীষিকা থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু চেঙ্গিজের পথ অনুসরণ করে মোঙ্গলরা হিন্দুস্থানের পথ চিনে রাখল। চেঙ্গিজ রাশিয়ার সৈন্যদের বিধ্বস্ত করে কিয়েভের মহাসামন্তকে বন্দী করেছিলেন।

চেঙ্গিজ যেখানে গেছেন, সেখানেই ভেঙে-চুরে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। কত মানুষের প্রাণ যে তাঁর জন্য

বিনিষ্ট হয়েছে তা হিসাব করে বলা যায় না। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কেউ-ই তাঁর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। ঘর-বাড়ী, মসজিদ, গ্রন্থাগার কিছুই তিনি বাদ দেননি। বস্তুত, তাঁর আক্রমণে সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। চেঙ্গিজের সাম্রাজ্য পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে রাশিয়ার নিপার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

চেঙ্গিজ যুদ্ধে কখনও পরাস্ত হননি। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য চেঙ্গিজ শঠতা, প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। চেঙ্গিজ খান একদিকে যেমন ছিলেন হৃদয়হীন দুধর্ষ যোদ্ধা, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন এক বুদ্ধিমান শাসক। তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারতেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন, অন্যান্য মোঙ্গলরাও ছিল তাই। মুখের কথাতেই সব কাজ চলত। সম্ভবত, লেখা বলে যে কোন বস্তু আছে চেঙ্গিজ তা জানতেন না। কিন্তু যখনই তিনি তা জানতে পারলেন, তখনই নিজের ছেলেদের ও দলের অন্যান্য নেতাদের আদেশ দিলেন লেখাপড়া শিখতে।

ধর্মের দিক দিয়ে চেঙ্গিজ ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি গভীর রাতে সপরিবারে চন্দ্র ও নক্ষত্রের পুজো করতেন আর দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্র পাঠ করতেন। তিনি একবার বিভিন্ন ধর্মযাজকদের সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁদের বক্তৃতা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, সব ধর্মেই কিছু ভাল উপদেশ আছে।

চেঙ্গিজের বংশধরদের রাজ্যবিস্তার ঃ চেঙ্গিজের মৃত্যর পর তাঁর পুত্র ওগতাই খান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। তিনি পিতৃশত্রু জালালউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করলেন। তারপর তিনি আজার-বাইজান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া লুঠ করলেন। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ওগতাই চীন বিজয় সম্পূর্ণ করেন। এক বছরের মধ্যে রাশিয়ার কিয়েভ নগর বিজিত ও ভস্মীভূত হল। রাশিয়া মোঙ্গলদের পদানত হল। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে পোলাণ্ড-জার্মানীর মিলিত বাহিনী দক্ষিণ সাইলেসিয়াতে মোঙ্গলদের কাছে পরাজিত হল। বস্তুত সমগ্র ইউরোপ মোঙ্গলদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এই সময় হঠাৎ ওগতাই মারা যান।

১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওগতাই-এর মৃত্যুর পর মঙ্গু খান মোঙ্গলদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মঙ্গু তাঁর এক ভাই কুবলাই খাঁকে চীন দেশের প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। স্বয়ং মঙ্গু তিব্বত অধিকার ও ধ্বংস করলেন। ক্রমে পারস্য ও সিরিয়াও আক্রান্ত হল। মঙ্গুর আর এক ভাই হলাগু পশ্চিমে বাগদাদ শহর আক্রমণ করে একেবারে ধূলিসাৎ করেন। শহরের শিল্প-সম্পদ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সবকিছু বিধ্বস্ত হল, মানুষের রক্তে তাইগ্রীস নদীর জল লাল হয়ে উঠল।

ইউয়ান বংশ (১২৮০—১৩৬৮ খ্রীঃ) মঙ্গু খানের মৃত্যুর পর কুবলাই খান, প্রধান 'খানের' অর্থাৎ নেতার পদ লাভ করেন। তিনি মোঙ্গলদের প্রধান রাজধানী কারাকোরামের পরিবর্তে চীনের পিকিং শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় থেকে মোঙ্গল সাম্রাজ্য মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্বে কুবলাই খান আর পশ্চিমে হলাগু রাজত্ব করতে থাকেন। কুবলাই চীন দেশকে তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্র করে তোলেন। এইভাবে চীনদেশে বিখ্যাত ইউয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পিকিং শহরটি কুবলাই নির্মাণ করেন। তিনি চীনা সভ্যতা গ্রহণ করে মোঙ্গলদের সুসভ্য জাতিরূপে গড়ে তোলেন। কুবলাই স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং চীনবাসী তাঁকে জাতীয় সম্রাট বলে গ্রহণ করে। ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যুর পর সমস্ত মোঙ্গল জাতির নেতারূপে কেউ আর 'খান' নির্বাচিত হননি। কুবলাই খানের মৃত্যুর একশ বছর পরে মোঙ্গলদের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

মোঙ্গল সভ্যতা : চেঙ্গিজের বংশধররা বর্বর ছিলেন না। চীনা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাঁদের স্বভাব-চরিত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। কুবলাই খানকে চীনের মানুষ ঘরের লোক বলে মনে করত। চীনাদের কাছ থেকে তারা বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার শিখে নিয়েছিল। মোঙ্গলদের মত সুশিক্ষিত সৈন্য তখন পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না।

মোঙ্গলদের বিশাল সাম্রাজ্য ইউরোপ ও এশিয়ায় বিস্তৃত হওয়ায় এই দুই মহাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। মোঙ্গল রাজসভায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি হাজির হতেন। তাই এই সব দেশের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান সহজ হয়ে উঠেছিল।

মার্কো পোলো: ইটালির পরিব্রাজক মার্কো পোলো-র ভ্রমণকাহিনী থেকে সম্রাট কুবলাই খান ও তাঁর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। মার্কো পোলো দীর্ঘকাল কুবলাই খানের সাম্রাজ্যে বাস করেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস বন্দরে তিনজন প্রবাসী অবতরণ করলেন। দু'জন বৃদ্ধ—জীর্ণ ও ক্লান্ত, অন্য একজন প্রৌঢ়—দীর্ঘদেহ, সুস্থ ও বলিষ্ঠ। যদিও তাঁরা ছিলেন ভেনিসের লোক, তবু ভেনিসের অধিবাসীরা এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের চিনতে পারল না। এই তিনজন হলেন, নিকলো পোলো, তাঁর ভাই মাফিয়া পোলো এবং নিকলোর পুত্র মার্কো পোলো। পোলো পরিবারের আত্মীয়-স্বজনরা জানতেন যে তাঁদের এই তিনজন আত্মীয় বণিক অনেক দিন আগে পূর্ব এশিয়াতে ব্যবসার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু আর ফিরে আসেননি। তাঁদের ধারণা ছিল এরা তিনজনই মারা গেছেন। একদিন এই তিন পোলো আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করলেন। বিরাট ভোজের আয়োজন হল। ভোজনের পর তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে পোলোরা তাঁদের ভ্রমণের পোশাক খণ্ডিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু মণি, মুক্তা, হীরা, পান্না,

মার্কো পোলো

চুনী বের হয়ে এল। সকলে অবাক হলেন। তাঁরা এবার বিশ্বাস করলেন যে এই তিনজন ব্যক্তিই পোলো পরিবারের বহুদিনের বিস্মৃত সন্তান।

দেশে ফেরবার পর ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসের সঙ্গে জেনোয়ার জলযুদ্ধে মার্কো পোলো বন্দী হলেন। কারাগারে তিনি তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণকাহিনী রাসটিকিয়ানো নামে একজন বন্ধুকে গল্পচ্ছলে বলতেন, আর বন্ধু সেই কাহিনী লিখে রাখতেন।

মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীঃ মার্কোর বাবা ও কাকা ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। তাঁরা একবার খোয়ারিজম রাজ্যের বোখারা শহরে যান। তাঁরা সেখানে কুবলাই খানের প্রবল প্রতাপ ও তাঁর অতুল ঐশ্বর্যের কথা শুনতে পান। তাই চীনদেশে ব্যবসা করে লাভ করার জন্য তাঁরা পিকিং-এ এসে উপস্থিত হলেন। তাদের কথা-বার্তা শুনে কুবলাই সন্তুষ্ট হলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে জানবার তাঁর খুব আগ্রহ হল। তাই ইউরোপ থেকে কয়েকজন পাদ্রীকে আনবার জন্য তিনি অনেক ধনরত্ন দিয়ে পোলোদের দেশে পাঠিয়ে দিলেন। দু'বছর পরে আবার তাঁরা হাঁটা পথে চীনের দিকে যাত্রা করলেন। এবার মার্কো পোলোকে তাঁরা সঙ্গে নিলেন। পশ্চিম এশিয়ার নানাস্থান ঘুরে তাঁরা তুর্কীস্থানে যান। তারপর গোবি মরুভূমি পার হয়ে পিকিং-এ এসে উপস্থিত হন। ভেনিস থেকে পিকিং-এ আসতে তাঁদের সাড়ে তিন বছর লেগেছিল।

মার্কো পোলোর উজ্জ্বল দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে কুবলাই খান মুগ্ধ হলেন। পথে মার্কো পোলো তুর্কীস্থানী ভাষাও শিখেছিলেন। তিন পোলোই রাজকার্যে নিযুক্ত হলেন। কুবলাই খান সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় সংবাদ আদান-প্রদানের ভার মার্কো পোলোকে দিয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁকে হাঙচাউ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ষোল বছর চীনে কাটাবার পর পোলোরা দেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু কুবলাই কিছুতেই রাজী হলেন না। হঠাৎ

এক সুযোগ এসে উপস্থিত হল। পারস্য দেশের মোঙ্গল সম্রাট বিবাহের জন্য কুবলাইয়ের কাছে এক রাজকন্যা চেয়ে পাঠালেন। এই

কুবলাইখানের সাম্রাজ্য ও মার্কোপোলোর ভ্রমণপথ

রাজকন্যাকে পারস্যে পৌঁছে দেবার ভার পড়ল পোলোদের ওপর। এবার তাঁরা জলপথে রওনা হলেন। সুমাত্রা ও ভারতবর্ষ হয়ে তাঁরা

প্রায় দু' বছর পরে পারস্যে পৌঁছলেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা দেশে ফিরে এলেন চব্বিশ বছর পর ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

কুবলাই-এর রাজধানী পিকিং শহরটি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এর মধ্যে আবার আর একটি প্রাচীর ঘেরা ছোট্ট শহর ছিল। সেখানেই ছিল কুবলাই-এর রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের আয়তন ছিল এক বর্গমাইল, দেওয়াল ও ছাদ ছিল সোনা-রূপা দিয়ে মোড়া এবং বিচিত্র কারুকার্য পরিপূর্ণ।

কুবলাই খান

মার্কো যে হাঙচাউ শহরের শাসনকর্তা ছিলেন সেখানে ছিল বড় বড় রাস্তা আর তার দুপাশে ছিল বড় বড় বাড়ী। সেই শহরে অনেকগুলি চওড়া খাল ছিল আর ছিল বার হাজার সেতু ও দশটি বড় বড় বাজার। প্রত্যেকটি বাজারই ছিল আধ মাইল লম্বা। অজস্র দোকান-পাট ছিল, আর ছিল ভারতীয় বণিকদের গুদাম-ঘর ও জনসাধারণের জন্য স্নানের ঘর। সোনার কাজ করা রেশমী কাপড় এবং নানারকম আশ্চর্য জিনিসপত্র বাজারে পাওয়া যেত।

কুবলাই খানের সাম্রাজ্য ছিল আয়তনে বিশাল। সমস্ত দেশ জুড়ে ছিল বৌদ্ধ-বিহার, সরাইখানা, বাগান, মাঠ ও আঙুরের খামার। চীনের শিল্পীরা ছিল খুবই নিপুণ। চীনের জরি ও রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্র অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সুদূর ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বণিকরা পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাতায়াত করত। মার্কো পোলো চীন থেকে প্রথম মুদ্রিত বই, মানচিত্র, কাগজের নোট ও মুদ্রা ইউরোপে নিয়ে আসেন।

মার্কো পোলো জাপান, সুমাত্রা, চম্পা, ব্রহ্ম, আন্দামান, নিকোবর ও সিংহল সম্বন্ধে বহু সত্য ও মিথ্যা কাহিনী বলেছেন—যেমন জাপানে সোনার গাছ, সোনার ফল, ব্রহ্মে হাজার হাজার যুদ্ধের হাতী, ভারতে কাকতীয় রাজ্যে রাণী রুদ্রাম্মার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ। ভারতীয় যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের যোগবলের কথাও মার্কো পোলো লিখে রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জাপান

এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে জাপানের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। জাপান আসলে কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। ছোট-বড় এই দ্বীপগুলি সারা এশিয়া ভূখণ্ডের পূর্বে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপগুলির মধ্যে হনশিউ, কিউশিউ, শিককু ও হোক্কাইডো প্রধান। জাপানের অধিকাংশ অঞ্চলই পাহাড়-পর্বতে ঘেরা। চাষবাস করার মত জমি জাপানে অতি অল্পই আছে। অল্প জমিতে বেশী পরিমাণে ফসল ফলাতে হবে। তাই জাপান আদিকাল থেকেই বিশেষভাবে তার চেষ্টা করে আসছে। ফলে, জাপানের মানুষ হয়ে উঠেছে খুবই পরিশ্রমী।

এমন একটা সময় ছিল যখন জাপানীরা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেত না, এমন কি বিদেশীদেরও জাপান তার নিজের দেশে ঢুকতে দিত না। দেশে বড় বড় সব দাইমিও বা জমিদার ছিল। এরাই ছিল দেশের সব ধন সম্পত্তির মালিক। এই জমিদার ছাড়া সামুরাই নামে আর একদল ছিল। তারা শক্তিশালী যোদ্ধা সম্প্রদায় বলে পরিচিত ছিল। তারা অনেকটা আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়দের মত সামরিক সম্প্রদায় বলেই পরিচিত ছিল।

জাপানের রাজাকে বলা হত মিকাডো। মিকাডোর ক্ষমতা কিন্তু খুব বেশী ছিল না। সামুরাইদের প্রতাপ ছিল মিকাডোর চেয়ে

অনেক বেশী। সামুরাইরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করত। এর মধ্যে এক একজন হয়ত বেশি ক্ষমতা-শালী হয়ে উঠত। তখন তার পরামর্শ মেনে চলা ছড়া রাজার কোন উপায় থাকত না। সামুরাইদের আত্মসম্মান জ্ঞান খুব বেশি ছিল। নিজের বা দেশের সম্মান রক্ষার জন্যে তারা প্রাণ দিতেও কুন্ঠিত হত না। তারা ছোরা দিয়ে পেট চিরে আত্মহত্যা করত। একে বলে হারিকিরি।

জাপানের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। জাপানীদের মধ্যে অদ্ভুত এক ধারণা আছে যে তাদের সম্রাট বংশের উৎপত্তি হয়েছে সূর্যদেব থেকে এবং জাপানীরা যামাতোতে প্রথম রাজ্য স্থাপন করে। প্রায় ২০০ খ্রীষ্টাব্দে জিংগো নামে এক রাণী যামাতো রাজ্যের শাসক ছিলেন। কোরিয়ার সঙ্গে যামাতোর নিকট সম্পর্ক ছিল এবং কোরিয়ার মাধ্যমে যামাতোতে চীনা সভ্যতা প্রবেশ করেছিল।

জাপানে প্রথমে বড় বড় জমিদারদের হাতেই ক্ষমতা ছিল বেশি। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল ছিল। কয়েকটি মুষ্টিমেয় অভিজাত বংশ অনেক সময় জাপানে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হত। প্রথমে 'শোজা' বংশ জাপানে আধিপত্য লাভ করে। এই সময় জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। শোজা বংশের পর কামাটোর 'ফুজিওয়ারা' বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট এই বংশের হাতের পুতুলে পরিণত হন। জাপানের প্রথম রাজধানী ছিল নারা। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে কিয়োতোতে জাপানের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে টোকিওই জাপানের রাজধানী। এই টোকিওতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার আগে প্রায় ১১০০ বছর কিয়োতোই ছিল জাপানের রাজধানী।

জাপানের মানুষ নিজেদের দেশকে বলে 'দাই নিপ্পন' অর্থাৎ উদীয়মান সূর্যের দেশ। চীন ও কোরিয়া থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। জাপানের প্রাচীন ধর্মকে বলে শিন্তোধর্ম। প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের পুজো করার রীতি এই ধর্মে দেখা যায়।

জাপানে সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীন ও কোরিয়া থেকে এলেও জাপানে এই সভ্যতা নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে। চীন সমাজে সৈনিকদের থেকে ব্যবসায়ীদের স্থান ছিল উঁচুতে, কিন্তু জাপানে সৈনিক শ্রেণীই চিরকাল শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে এসেছে। বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের সময় থেকে জাপানে শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস শুরু হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানে দুই শক্তিশালী বংশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় মিনামোতো বংশের যারিতোমো সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। সম্রাট তাঁকে সোগান বা প্রধান সেনাপতি উপাধিতে ভূষিত করেন। এর পর থেকে 'সোগান' উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। সোগানই হয় জাপানের প্রকৃত শাসনকর্তা। প্রায় সাতশ বছর পর্যন্ত সোগানরা জাপান শাসন করেন। সম্রাটের হাতে আর কোন ক্ষমতা থাকল না।

কামাকুরায় যারিতোমো তাঁর সামরিক রাজধানী স্থাপন করেন। সোগানদের শাসনকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আশিকাগা নামে জাপানে এক নতুন সোগান বংশের শাসনকাল আরম্ভ হয়। এঁদের শাসনকালে জাপানীরা চীনের কাছ থেকে ছবি আঁকা, কবিতা রচনা করা, বাড়ী তৈরীর কৌশল, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে।

এরপর জাপানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রায় একশ বছর জাপানে অরাজকতা ও সংঘর্ষ চলে। তারপর শত বছরের গৃহযুদ্ধ থেকে তিন ব্যক্তি জাপানকে উদ্ধার করেন। তাঁরা হলেন নোবুনাগা নামে একজন দাইমিও অথবা জমিদার, দ্বিতীয় হিদেযোশী নামে একজন কৃষক নেতা এবং তৃতীয় ইযেযাশু নামে একজন শক্তিশালী জমিদার। ইযেযাশু 'জেদো' শহর নির্মাণ করেন। এই শহরই পরবর্তীকালে টোকিও নামে পরিচিত হয়। ইযেযাশু তোকুগাওয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

একবার পোর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে জাপানী কর্তৃপক্ষ পোর্তুগীজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং বিদেশীদের

জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। ঘোষণা করা হল যে, কোন জাপানী বিদেশে যেতে পারবে না এবং কোন বিদেশী জাপানে ঢুকতে পারবে না। এইভাবে দুই শতাব্দীরও বেশী সময় জাপান অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ মধ্যযুগে জাপানে অভিজাত সম্প্রদায়ের নিজস্ব জমি ছিল যেগুলি ভূমিদাসরা চাষ করত। এই জমির মালিকদের কেন্দ্রীয় সরকারকে কর দিতে হত না। রাষ্ট্রেরও নিজস্ব অনেক জমি ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত করভারের জন্য চাষীরা সেই জমি চাষ করত না। পরে রাষ্ট্র সেই জমিগুলি সামুরাইদের মধ্যে বিলি করে দেয়। ইউরোপের নাইটদের সঙ্গে সামুরাইদের তুলনা করা যায়। এইভাবে জাপানে বিভিন্ন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ মঠগুলিরও নিজস্ব জমি ছিল। চাষীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। তারা জমিতে যা ফলন ফলাত, তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কর এবং খাজনা হিসাবে দিতে হত। কৃষকরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহ করত। জাপানের ইতিহাসে এই সব কৃষক বিদ্রোহের কথা লেখা আছে। তোকুগাওয়া শাসকরা রাষ্ট্রের মালিকানায় জমি এনেছিলেন এবং সেগুলি দাইমিওদের বিতরণ করেছিলেন। সোগানরা দাইমিওদের নিয়ন্ত্রণ করত। তবে দাইমিওরা নিজেদের এলাকায় স্বাধীন ছিল এবং তারা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখতে পারত।

তোকুগাওয়া সোগানরা প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। সর্বোচ্চে ছিল সামুরাই। সামুরাইদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধর্মের লোক। তাদের মধ্যে দাইমিও ছিল, আবার সাধারণ সৈনিকও ছিল। সামুরাইরা নানা সুবিধা ভোগ করলেও সাধারণ সৈনিকরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারত না। যখন তাদের কোন মনিব থাকত না, তখন তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হত। কৃষকদের ওপর জমির মালিকরাও অত্যাচার চালাত। কর ও খাজনা দেওয়া ছাড়াও কৃষকদের বাধ্যতামূলকভাবে

জমিদারের হয়ে বেগার খাটতে হত। সমাজের নিম্ন অংশে ছিল কারিগর ও শিল্পীরা। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণীর অবস্থা স্বচ্ছল হতে লাগল, যদিও তারা সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্তই ছিল। ভারতীয় সমাজের মত এখানেও একটি জাতিচ্যুত শ্রেণী ছিল। জাপানের মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাপানের অনেক শহর ও নগর গড়ে উঠল। জাপানে তখন তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। তোকুগাওয়াদের শাসনকালে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে।

ধর্ম ও সংস্কৃতি : জাপানী সভ্যতার অনেক কিছুই চৈনিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই চীনের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ ছিল। জাপানের বর্ণমালা চীনের অনুকরণে তৈরী হয়েছিল। চারশো খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের বর্ণমালা গ্রহণ করেছিল। জাপানের প্রাচীন সাহিত্যও চীনা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জাপানের পণ্ডিতরা চীন দেশে গিয়ে কনফুসিয়াসের দর্শন শিখেছিলেন। এমনি করেই আস্তে আস্তে এক বিশেষ জাপানী সাহিত্য গড়ে উঠল। অভিজাত বংশের স্ত্রীলোকরা কবিতা ও উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'হাইকু' নামে এক ধরনের কবিতা জাপানে সেই সময় লেখা হত যা পৃথিবীর অন্য দেশের কবি ও সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছে। 'কাবুকি' নামে এক বিশেষ ধরনের থিয়েটারও এই সময় জাপানে খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদিতেও জাপানীরা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল। জাপানীরা পুষ্প-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। জাপানে প্রাচীনকালে শিন্তোধর্ম প্রচলিত ছিল। এই ধর্ম অনুসারে তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পুজো করতো। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়ার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করেছিল। জাপানী সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বৌদ্ধ মন্দির তৈরী করতে জাপানীরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। জাপানে এবং আমাদের ভারতবর্ষেও জাপানীদের তৈরী সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির

দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দীতে জাপানের পুরানো রাজধানী নারাতে একটি বৌদ্ধ মন্দির তৈরী হয়েছিল। এই মন্দিরের হলঘর ছিল ৯৫ মিটার লম্বা, ৫৫ মিটার চওড়া এবং ৫০ মিটার উঁচু। দশ মিটার দীর্ঘ ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তি এই মন্দিরে রাখা ছিল।

আধুনিক জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় জাপান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ওপরই গড়ে উঠেছিল। বাইরের দেশের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জাপানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটিও দেখা দিয়েছিল।

একাদশ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

গুপ্ত যুগের শেষাংশে ভারতে হূণ আক্রমণঃ বর্বরদের আক্রমণে যখন ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় ভারতে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল সাম্রাজ্য। রোমানরা যেমন ইউরোপে এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, গুপ্ত সম্রাটরাও তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানে সাহায্য করে ভারতীয় সভ্যতাকে এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের মতই গুপ্ত সাম্রাজ্যও একদিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। ইতিহাসে বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন যেভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছে, এক্ষেত্রেও তাই হল। দেশের ভেতরে গোলমাল, হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, বিবাদ, লোভ, ভোগ, বিলাসিতার দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্তি এবং বড় আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, আর বাইরে এই দুর্বলতার সুযোগে বিদেশী শক্তির আক্রমণ, এই দুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণ গুপ্ত সাম্রাজ্যকে এক নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল।

তৃতীয় গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী শকদের পরাজিত করে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শকদের পরাজিত করে

সৌরাষ্ট্র ও মালব অধিকার করেন ও উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে মধ্য এশিয়া থেকে এসে হূণরা ভারতের সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করে। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, ততদিন হূণরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভেতরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের পরে অন্যান্য গুপ্ত রাজাদের রাজত্বের সময় শ্বেত-হূণরা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণে আক্রমণে অস্থির করে তুলল। অন্যদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে শুরু হল আত্মকলহ। প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও এই সুযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে আরম্ভ করল।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হূণ জাতির একটি শাখা গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে শিয়ালকোট অধিকার করেছিল। হূণরা পারস্য, কাবুল, ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আমাদের দেশে যে হূণরা এসেছিল, তাদের রঙ ছিল সাদা। তাই তাদের বলা হয় শ্বেত-হূণ। ক্রমে হূণরা তাদের ক্ষমতা মালব পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। এই হূণদের নেতা ছিলেন তোরমান। হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায়, বালাদিত্য নামে এক গুপ্ত সম্রাটের কাছে তোরমান পরাজিত হয়েছিলেন।

মিহিরকুলঃ তোরমানের পুত্র মিহিরকুল ছিলেন এটিলার মতই সাহসী ও নিষ্ঠুর রাজা। ভারতে জন্ম হলেও তাঁর বংশগত নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। গল্প আছে তিনি উঁচু ঢালু পাহাড়ের ওপর থেকে হাতীকে গড়িয়ে ফেলে দিতেন। বিশাল হাতী ভীষণ আর্তনাদ করতে করতে নীচে পড়ে যেত। হাতীর সেই করুণ আর্তনাদ মিহিরকুলকে আনন্দ দিত। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী'-তে মিহিরকুলের নিষ্ঠুরতার বর্ণনা আছে। মিহিরকুল বৌদ্ধদের পছন্দ করতেন না। তাদের ওপর তিনি খুব অত্যাচার করতেন, আর বৌদ্ধ মঠ ও বিহার দেখলেই ভেঙে ফেলতেন।

বালাদিত্য নামে গুপ্ত বংশের একজন রাজা দুর্ধর্ষ মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু মার আদেশে তিনি এতবড় শত্রুকে

হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মালবের অন্তর্গত মান্দা-শোরের রাজা যশোধর্মণ তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের পর হূণ শক্তি প্রায় বিধ্বস্ত হল। এর পর মিহিরকুল কাশ্মীর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা কাশ্মীরের রাজাকে হত্যা করে কাশ্মীর অধিকার করেন।

মিহিরকুল হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিবের উপাসনা করতেন। তাঁর মুদ্রায় শিবের বাহন বৃষমূর্তি খোদাই দেখা যায়। তাঁর মৃত্যুর পর শ্বেত-হূণরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করতে লাগলেন। পরবর্তী যুগের রাজপুত জাতির মধ্যে হূণ রক্তের সংমিশ্রণ আছে বলে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা।

হূণ আক্রমণ যেমন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল, তেমনি এর সামাজিক প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই সময় দেশের চারিদিকে যে অরাজকতা দেখা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন ও উপকারিতার কথা অনেকে অনুভব করেন। কিন্তু এর ফলে উচ্চ জাতি বা বর্ণের প্রাধান্য আরও বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নিম্ন জাতিভুক্ত মানুষের মর্যাদা আরও কমে যায়। দেশ শাসন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি-চর্চা কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই বিভেদ ও বৈষম্য ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল।

হর্ষবর্ধন ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশ বছর পরে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশের উত্থান হয়। থানেশ্বরের গোড়ার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুপ্ত সাম্রাজের পতনের পর পুষ্যভূতি বংশের প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। তখন থেকেই থানেশ্বর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন নামে প্রভাকরবর্ধনের দুই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা ছিল। প্রভাকরবর্ধন ছিলেন হিন্দু, তিনি ছিলেন শিবের

উপাসক। প্রভাকরবর্ধন তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মণের বিয়ে দেন।

হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করে রাজ্যবর্ধন পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। এদিকে মাতা যশোমতীও সরস্বতী নদীতীরে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাই শোকার্ত রাজ্যবর্ধন রাজপদ গ্রহণ করবেন না বলে ঠিক করলেন। এই সময় তিনি খবর পেলেন, মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক একযোগে কনৌজ আক্রমণ করেছেন এবং গ্রহবর্মণকে হত্যা করে তাঁরা রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করেছেন। হর্ষবর্ধনকে রাজ্যের ভার দিয়ে রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করলেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত রাজ্যবর্ধনের হাতে পরাজিত হলেন, কিন্তু ফেরবার পথে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হলেন।

কনৌজ ও থানেশ্বরের রাজপদ একই সময়ে শূন্য হলে ঐ দুই রাজ্যের মন্ত্রীদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন দুই দেশেরই সিংহাসনে আরোহণ করলেন (৬০৬ খ্রীঃ)। রাজা হয়েই হর্ষবর্ধনের কাজ হল রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পৃথিবী 'গৌড়শূন্য' না করতে পারেন, তাহলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। আসামের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে তিনি মিত্রতা করলেন। তিনি খবর পেলেন যে রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হয়ে সদলবলে বিন্ধ্যপর্বতের জঙ্গলে চলে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করলেন। রাজ্যশ্রী তখন হতাশ হয়ে বনের মধ্যে আগুনে ঝাঁপ দেবার আয়োজন করছিলেন।

হর্ষবর্ধন

কনৌজের ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের পরিচয় 'কুমার শিলাদিত্য' নামে। থানেশ্বর থেকে হর্ষবর্ধন কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় কনৌজ নগরী উত্তরাপথে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।

হর্ষবর্ধন ছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট। তাঁর রাজ্যসীমা উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা তীর, পশ্চিমে বল্লভী থেকে পূর্বে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার জন্য হর্ষবর্ধন পশ্চিমে মালবরাজ দেবগুপ্ত এবং পূর্বে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মিত্রতা করেন। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে শশাঙ্ক যে ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ জয় করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের বিজয় বাহিনী উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তিনি নর্মদা নদী অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়ে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন। সৌরাষ্ট্রের বল্লভীরাজ ধ্রুবসেন কিন্তু হর্ষবর্ধনের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে হর্ষবর্ধন গঞ্জাম জেলার কোঙ্গদ জয় করেন। হর্ষবর্ধনের রাজ্য পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। একটি শিলালিপিতে হর্ষবর্ধনকে 'উত্তরাপথনাথ' বা সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কামরূপ (আসাম), সিন্ধু ও কাশ্মীরও হর্ষবর্ধনের মিত্র রাজ্য ছিল। বস্তুত, তাঁর খ্যাতি সুদূর চীনেও পৌঁছেছিল।

হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা : হর্ষবর্ধন দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। শাসনব্যবস্থা ঠিকমত চলছে কিনা দেখবার জন্য তিনি নিজে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। শাসন-সংক্রান্ত সব বিষয়ই ছিল তাঁর হাতে। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ছিল কতকগুলি ভুক্তি বা প্রদেশে বিভক্ত। আবার ভুক্তি বা প্রদেশ

ছিল কতকগুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত। উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের একভাগ রাজকর হিসাবে গ্রহণ করা হত। বিনা মজুরীতে কাউকে খাটানো হত না। রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন প্রজাদের প্রিয়। অশোকের মত তিনিও পান্থশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধমঠ ও হিন্দুমন্দির স্থাপনের জন্যও হর্ষবর্ধন অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

রাজধানী কনৌজ : গ্রহবর্মণের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন কনৌজের সিংহাসন লাভ করেন এবং কনৌজই তাঁর সাম্রাজ্যর রাজধানী হয়। কনৌজ গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। উঁচু প্রাচীর দিয়ে সমস্ত শহরটি ঘেরা ছিল। বড় বড় প্রাসাদ, সুন্দর সুন্দর উদ্যান, স্বচ্ছ জলের সরোবর শহরটিকে বড় মনোরম করে তুলেছিল। নানা দেশ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র আমদানি হত শহরে। সেখানকার অধিবাসীরা ছিল অবস্থাপন্ন। রেশমের তৈরী পোশাক ও নানা মূল্যবান পরিধেয় শহরবাসীরা ব্যবহার করত। কনৌজ ছিল শিল্প ও বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র।

হর্ষবর্ধনের চরিত্র : হর্ষবর্ধন ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বাণভট্ট তাঁর সভা উজ্জল করেছিলেন। বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' নামে একটি বই লিখেছিলেন। 'হর্ষচরিত' থেকে হর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, দানশীলতা, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। হর্ষবর্ধন স্বয়ং একজন কবি ছিলেন। তাঁর রচিত তিনখানি নাটক 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' সংস্কৃত ভাষায় অতি উচ্চস্তরের সাহিত্য হিসাবে গণ্য হয়।

হিউয়েন সাঙ : বৌদ্ধ তীর্থদর্শন এবং ধর্মপুস্তক সংগ্রহের জন্য অনেক চৈনিক পরিব্রাজক যুগে যুগে ভারতে এসেছিলেন। উনত্রিশ বছর বয়সে (৬২৯ খ্রী) চীন সম্রাট তাই সুঙ-এর রাজত্বকালে কয়েক-জন অনুচর-সহ মরুভূমির পথে গোপনে হিউয়েন সাঙ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। হিউয়েন সাঙ পর্বতের পাশে উপস্থিত হয়ে গিরিপথ

অতিক্রম করার সময় হিউয়েন সাঙ-এর বারোজন সঙ্গী প্রবল হিমপ্রবাহের আঘাতে মারা যান। ক্রমে তাঁরা তাসখন্দ রাজ্যে এলেন। তাসখন্দের দিকে যাওয়ার সময় হিউয়েন সাঙ-এর চারজন পথ-প্রদর্শক ছিলেন। অবশেষে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে হিউয়েন সাঙ ভারতে পৌঁছলেন।

হিউয়েন সাঙ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি এদেশের যেখানে যা দেখেছেন তার সবকিছুই সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর পুঁথি থেকে তখনকার ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ ঃ হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, ভারতে তিনি অনেক পরিত্যক্ত নগর ও গ্রাম দেখেছেন। সাধারণ চলাচলের পথগুলি অনেক জায়গায় অত্যন্ত বিপদসংকুল ছিল। শুধু হিংস্র জীবজন্তু নয়, চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুর্বৃত্তরা পথিকদের সর্বস্ব লুঠে নেবার জন্য সর্বদাই ঘোরা-ফেরা করত। তিনি ভারতের দুর্দশার কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি তিনি যে বহু জনাকীর্ণ নগর ও গ্রাম দেখেছিলেন, সে বিষয়েও লিখেছেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে গড়া ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে, ব্রাহ্মণরা সরল, অনাড়ম্বর ও পবিত্র জীবন-যাপন করত। শূদ্ররা ছিল কৃষক। ভারতীয়দের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, তাদের স্বভাব ছিল নির্মল।

ভারতবাসীর পোশাক ছিল খুব সাদাসিধে, সাধারণত তাতে কোন সেলাইয়ের দরকার হত না। পুরুষরা একখানা কাপড় বগলের তলা থেকে জড়িয়ে পরত, কাঁধ থাকত খোলা। মেয়েরা কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত একটা ঢিলেঢালা সেমিজের মত পোশাক পরত। মেয়েরা এবং রাজপুরুষরা যথেষ্ট পরিমাণে গহনা ও অলঙ্কার পরত। দুধ, ঘি, চিনি, মুড়ি প্রভৃতি সাধারণ খাদ্য ছিল। মাছ, ভেড়া ও হরিণের মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় পাঁচ বছর ছাত্র হিসাবে অতিবাহিত করেন। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকাহিনীতে নালন্দার বিস্তৃত বিবরণ আছে। পাটনা জেলার বড়গাঁও গ্রামে প্রাচীন নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়ত, অধ্যাপক
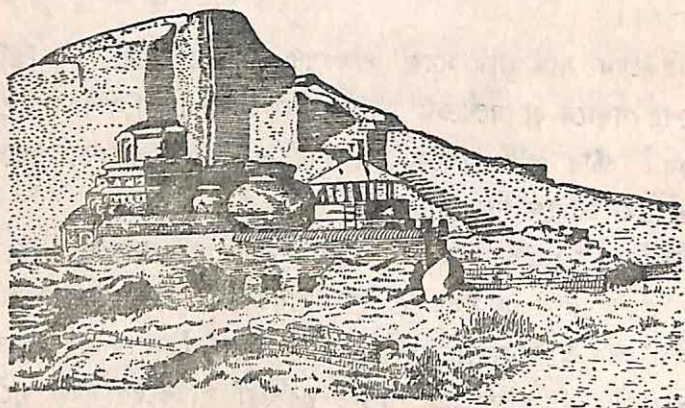
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

ছিলেন একশ। এখানে বৌদ্ধদর্শন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন, ন্যায়, সংখ্যা, ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অঙ্ক পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে এখনকার মত অধ্যাপকরা বিভিন্ন কক্ষে পড়াতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট পাঠাগার ছিল আর ছিল ছাত্রদের বাসোপযোগী এক প্রকাণ্ড ছ'তলা বাড়ী। সেখানে ভর্তি হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। প্রতি দশজনের মধ্যে দুজন কি তিনজনকে ভর্তি করা হত। শিক্ষার জন্য বেতন বা খাদ্যের জন্য অর্থ দিতে হত না। দেশের রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই বিদ্যালয়ের খরচ চালাতেন। চরিত্রের শুদ্ধতায় ও পাণ্ডিত্যে নালন্দার ভিক্ষুরা আদর্শস্থানীয় ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন মহাপণ্ডিত শীলভদ্র। তিনিই ছিলেন হিউয়েন সাঙের শিক্ষাগুরু।

হিউয়েন সাঙ কনৌজে হর্ষবর্ধনের রাজসভায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে হর্ষবর্ধনের ধর্ম, ধর্মের শোভাযাত্রা,

হর্ষের দানশীলতা ও কনৌজের সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে। হর্ষবর্ধন স্বয়ং শৈব ছিলেন। কিন্তু সকল ধর্মের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং রাজ্যে জীব হত্যা নিষিদ্ধ করেন। বিদেশী অতিথিদের সম্মানার্থে তিনি কনৌজে এক বিরাট ধর্মসম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন একমাস ধরে চলেছিল। প্রতিদিন স্বর্ণময় মূর্তিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হত। শোভাযাত্রা শেষে হর্ষবর্ধন স্বয়ং বুদ্ধদেবের অর্চনা সম্পন্ন করতেন। এরপর ধর্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হত। বিরাট ভোজের পর সম্মেলন শেষ হত।

কনৌজের উৎসব শেষ হলে হর্ষবর্ধন তাঁর অতিথি হিউয়েন সাঙ-কে নিয়ে প্রয়াগে উপস্থিত হন। সেখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিরাট উৎসব হত। এই উৎসবে বুদ্ধ, শিব ও সূর্যের পুজো হত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রার্থীকে অর্থ বিতরণ করা হত। দানের শেষে তিনি নিজের অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদও বিতরণ করে শুধু একখানি পুরানো কাপড় পরে থাকতেন।

৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজধানী বাতাপী নগরীতে গিয়েছিলেন। হিউয়েন সাঙ চৌদ্দ বছর ধরে ভারতের বৌদ্ধতীর্থ ও নগরগুলি ভ্রমণ করে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগ

(অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

হর্ষবর্ধনের পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পুষ্যভূতি বংশের গৌরবময় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী পঁচাত্তর বছরের ইতিহাস প্রায় অজানা রয়ে গেছে। আনুমানিক ৭২৫ থেকে

৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যশোবর্মণ নামে এক বীর নায়ক কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। যশোবর্মণকে কাশ্মীর রাজ্যের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় এই সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি : ভারতীয় সমাজে বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত। এই সাড়ে পাঁচশো বছরের ইতিহাসকে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ 'রাজপুত জাতির ইতিহাস' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার কারণ, এই যুগে রাজপুত জাতিগুলির ইতিহাসই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। গুর্জর, প্রতিহার, চন্দেল্ল, চৌহান, পরম্পর, চালুক্য, গাহড়বাল, কলচুরি প্রভৃতি রাজ্যের শাসকরা জাতিতে রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। একটি মত হল, তাঁরা বৈদিক যুগের প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশধর। কিন্তু বহু ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতরা শাক্য, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছিল। এইসব জাতি ভারতীয় জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্য গ্রহণ করে। ফলে, কালক্রমে এক নতুন ক্ষত্রিয় সমাজের সৃষ্টি হয়। এই নব ক্ষত্রিয়রাই ইতিহাসে রাজপুত জাতি নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

ত্রিশক্তির সংগ্রাম : হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগে কনৌজ সাম্রাজ্যের গৌরব ম্লান হলেও কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমেনি। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে কনৌজ তখনও ছিল কেন্দ্র বিন্দু। অষ্টম শতকে কনৌজ অধিকার ছিল রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রমাণ স্বরূপ। কনৌজে অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এক সময় গুর্জর, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পাল রাজাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। কনৌজ অধিকার করার জন্য এই ত্রিশক্তির সংগ্রাম ছিল ঐ যুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পালরাজ ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্রয়ুধকে পরাজিত করে নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। কিন্তু প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধকে কনৌজ থেকে বিতাড়িত করে সেখানে প্রতিহার বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মুঙ্গেরের কাছে এক যুদ্ধে তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারত আক্রমণ করে প্রতিহার রাজকে পরাজিত করলে পরোক্ষভাবে ধর্মপালের লাভ হয়। গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় কনৌজ অধিকার করেন। পালরাজ দেবপালের সময় আবার ত্রিশক্তির সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। দেবপাল সম্ভবত কনৌজের প্রতিহার রাজ মিহির ভোজকে পরাজিত করে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করেছিলেন। দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে জয়লাভের উল্লেখ থেকে মনে হয় দেবপাল রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষকেও পরাজিত করেছিলেন।

রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার সংগ্রাম থেকে বোঝা যায়, সেই সময় এই শক্তিশালী রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষ ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনবরতই চলছিল। কোন শক্তিই অপর শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলার ইতিহাস

শশাঙ্ক (আনুমানিক ৬০:—৬৩৮ খ্রীঃ) : সপ্তম শতকের গোড়ায় শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নামে একজন স্বাধীন নরপতি গৌড়ে রাজত্ব করতেন। কর্ণসুবর্ণের ইতিহাসে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান সোনা) স্বাধীন নরপতিরূপে শশাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। মালবরাজ দেবগুপ্ত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের সাহায্যে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণকে আক্রমণ ও নিহত করে গ্রহবর্মণের মহিষী রাজ্যশ্রীকে

কনৌজে বন্দী করেন। রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার আগেই শশাঙ্কের কূট চক্রান্তে তিনি নিহত হন। এর পর হর্ষবর্ধন গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে শাস্তি দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু শশাঙ্ককে তিনি পরাজিত করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। শশাঙ্ক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দেও গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, বুদ্ধগয়া ও উৎকল অঞ্চলে সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন।

শশাঙ্কের সময় বাংলা দেশ প্রথম উত্তর ভারতের এক প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বলেন, শশাঙ্ক নিজের হাতে বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ কেটে বুদ্ধমূর্তিটি সরিয়েছিলেন। এই পাপের ফলে শশাঙ্কের কুষ্ঠরোগে মৃত্যু হয়েছিল। মনে হয়, এই কাহিনী সত্য নয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিউয়েন সাঙের বিদ্বেষমূলক এক উপাখ্যান মাত্র।

পালবংশঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর বাংলা দেশে অনৈক্য, আত্মকলহ ও অরাজকতা চলেছিল। প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তি নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দুর্বল সবলের দ্বারা উৎপীড়িত হত। এই অবস্থাকে বলা হয় 'মাৎস্য ন্যায়'।

একশো বছর মাৎস্য ন্যায়ের পর বাংলার নেতৃস্থানীয় মানুষরা গোপাল নামে পাল বংশের এক ব্যক্তিকে বাংলার রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন। গোপালের শাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। গোপাল বৌদ্ধ ছিলেন। প্রায় চারশো বছর (আঃ ৭৬৫—১১৬২ খ্রীঃ) পাল রাজারা বাংলা দেশ শাসন করেন। এই সময়ের বাংলার ইতিহাস গৌরবময়।

ধর্মপাল (আঃ ৭৭০—৮১০ খ্রীঃ)ঃ গোপালের পুত্র ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করেন। বাংলা থেকে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ধর্মপাল পাটলিপুত্রে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহার ধর্মপালের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ওদন্তপুরে ও রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহারও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

দেবপাল (৮১০—৮৫০ খ্রীঃ): ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল পাল বংশের সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার মত একজন শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। গুর্জর, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট রাজাদের দেবপাল যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার বৌদ্ধ রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপন করেছিলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের গৌরব ম্লান হতে থাকে। প্রতিহার ও কম্বোজ রাজাদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। একাদশ শতকের প্রথম ভাগে পাল বংশের নবম রাজা প্রথম মহীপাল (আঃ ৯৮৮—১০৩৮ খ্রীঃ) পাল বংশের হৃত গৌরব কিছুটা উদ্ধার করেন। তাঁর রাজত্বকালে আচার্য ধর্মপালের নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধধর্ম প্রচারক তিব্বতে যান। প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে চেদীরাজ লক্ষ্মীকর্ণ পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। নয়পালের রাজত্বকালেই বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ধর্মপ্রচারের জন্য তিব্বতে যান।

কৈবর্ত বিদ্রোহ: নয়পালের পৌত্র দ্বিতীয় মহীপালের সময় পাল সাম্রাজ্য পুনরায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তাঁর কুশাসনের ফলে দেশে বিদ্রোহ হয়। দ্বিতীয় মহীপালের সময় কৈবর্তজাতীয় দিব্য বা দিব্যোকের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীদের হাতে মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন। বিদ্রোহীরা উত্তরবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করল। এই বিদ্রোহ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রভূমির রাজা হন। অবশেষে দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তরবঙ্গ উদ্ধার করেন। তাঁর মন্ত্রী কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে এই যুদ্ধের

কাহিনী বর্ণিত আছে। রামপালের পর পাল বংশের আবার পতন শুরু হয়।

সেন বংশের প্রতিষ্ঠা : একাদশ শতাব্দীতে সামন্ত সেন এবং তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন কর্ণাট থেকে বাংলা দেশে এসে রাঢ় অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয় সেন দুর্বল পালরাজাকে পরাজিত করে বাংলা দেশে সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয় সেন ছিলেন সামন্ত সেনের পৌত্র। বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করার পর বিজয় সেন উত্তর বিহার, কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজাদেরও পরাজিত করেন।

বল্লাল সেন (১১৫৯—১১৮১ খ্রীঃ) : বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। যে সব ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরা আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্রে সে সময় শ্রেষ্ঠ ছিলেন রাজা তাঁদেরই সমাজে সর্বোচ্চ আসন দেন। এই-ভাবে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি হয়। বল্লাল সেন সমাজ-সংস্কারক, বিদ্বান ও বীর ছিলেন। তিনি নেপাল, ভূটান আরাকান ও ব্রহ্ম অঞ্চলে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন।

লক্ষ্মণ সেন (১১৮১—১২০৫) : বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ছিলেন সমগ্র বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। তিনি কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন। পুরী, বারানসী ও প্রয়াগ ক্ষেত্রে তিনি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনিও পিতা বল্লাল সেনের মত বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি এবং শরণ নামে পাঁচজন কবি লক্ষ্মণ সেনের সভা অলঙ্কৃত করতেন।

মুসলমানদের নদীয়া জয় : বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণ সেন ধর্মচর্চা ও গঙ্গা-স্নান করবার জন্য গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ বা নদীয়াতে বাস করতেন। এই স্থান সুরক্ষিত ছিল না। ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন, কথিত আছে, মাত্র সতের জন সৈন্য নিয়ে ইক্তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খলজী বাংলা দেশ জয় করেন। এই কিংবদন্তী বিশ্বাস করা শক্ত। কারণ তুর্কীরা বলেছেন, লক্ষ্মণ সেন ও বিশ্ব সেন মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পরেও প্রায় চল্লিশ বছর পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন।

পাল ও সেন আমলে বাংলা দেশ : পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় যুগ। পাল রাজাদের শাসন-কালে বাংলা দেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সেই সময়েই বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটে। পাল ও সেন আমলে বহু লেখক, কবি ও ধর্মাচার্য বাংলা দেশকে অলঙ্কৃত করেন এবং বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন করেন।

সাহিত্য : পাল ও সেন রাজাদের আমলেই বাংলা ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হয়। বাংলা রচনার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ। এই পদগুলি সাহিত্য হিসাবে রচিত হয়নি, রচিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মচর্চার অঙ্গ হিসাবে। আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদগুলি রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। রচয়িতারা সকলেই ছিলেন প্রাচীন বাংলার অধিবাসী। রচনাগুলির মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাঙালী জীবনের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। পাল রাজত্বের শেষ দিকে সন্ধ্যাকর নন্দী নামে এক কবি সংস্কৃত ভাষায় 'রামচরিত' নামে এক ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি একদিকে রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী ও অপরদিকে পালরাজ রামপাল এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাহিনী।

কবি জয়দেব সে যুগের উজ্জ্বলতম রত্ন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তাঁকে সর্বভারতীয় কবির সম্মান এনে দিয়েছিল। অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী জয়দেবের লেখনীতে প্রাণময় হয়ে উঠেছিল। বল্লাল সেন স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় 'দানসাগর ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেন যুগের আর একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধ্যক্ষ (রাজপণ্ডিত) হলায়ুধ। হলায়ুধের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব'।

খাদ্য : বাঙালীরা চিরকাল ভোজন রসিক। ভোজনের বিচিত্র তালিকা প্রাচীন সাহিত্যে নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাংলাদেশের প্রধান ফসল ধান। ফলে, চিরকাল বাঙালী ভাত

খেতে অভ্যস্ত। গল্প আছে, যে, স্ত্রী কলার পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল, নালিতা (পাট) শাক ও দুধ পরিবেশন করত তার স্বামী প্রকৃতই পুণ্যবান। হরিণ, ছাগল ও পাখীর মাংস, মাছের নানারকম ব্যঞ্জন এবং দুধ, দই, পিঠে, পায়েস প্রভৃতি চিরদিনই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। পান-সুপারি খাওয়া বহুদিন থেকেই বাঙালী সমাজে প্রচলিত। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, আখ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণ বাংলার মাটিতে এখনও জন্মায়।

বেশভূষা : পোশাক-আসাকেই একটা বিশেষ জাতিকে চেনা যায়। বাঙালীরও একটা নিজস্ব বেশভূষা আছে, আজকের মত ধুতি শাড়িই ছিল তখনকার বাঙালীর প্রধান পোশাক। মেয়েরা শাড়ি পরত। প্রাচীন বাংলার ধুতির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল কম। হাঁটুর নীচে সাধারণত কাপড় নামত না। সভা সমিতিতে যাবার জন্য বিশেষ পোশাকের প্রচলন ছিল। শিশুরা পরত হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ধুতি বা আঁটসাট পায়জামা। চামড়ার জুতো ও কাঠের খড়ম— দুরকম পাদুকাই ব্যবহার করা হত। লাঠি ও ছাতার খুব প্রচলন ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও পুজো-পার্বনে, কার্পাস, রেশম ও পট্টবস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র ব্যবহৃত হত। তখনও সোনা, রূপা, মনিমুক্তা ও হীরার ব্যবহার ছিল। কেশ সম্বন্ধে বাংলার নারী অত্যন্ত বিলাসিনী ছিল।

আমোদ-প্রমোদ : আমোদ-প্রমোদেও বাঙালীর কতকগুলি নিজস্ব ধরনধারণ ছিল। শিকার ছিল প্রাচীন বাঙালীর আমোদ-প্রমোদের একটি প্রধান অঙ্গ। কুস্তী, কপাটি ও অন্যান্য শারীরিক ক্রীড়াও বাঙালী সমাজ প্রচলিত ছিল। দাবা, পাশা, ঘুঁটি খেলা, বাঘবন্দী, দশ-পঁচিশ প্রভৃতি খেলা প্রাচীন বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের খুবই প্রিয় ছিল। জুয়াখেলাতে বাঙালী বেশ পটু ছিল। মুরগী ও ভেড়ার লড়াইয়ের ওপর বাজি ধরা হত।

নাচ-গান চিরকালই বাঙালীর প্রিয়। করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, কাঁসর প্রভৃতি বাজনা বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল।

গীতাভিনয়ে বাঙ্গালীরা প্রচুর আনন্দ পেত এবং এতে তারা খুব পটু ছিল।

ধর্ম : পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের রাজত্বকালে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার লাভ হয়েছিল। সেন রাজারা হিন্দু ছিলেন। প্রাচীনযুগেও বাঙালী হিন্দুর প্রধান পর্ব ছিল দুর্গাপুজো। দোল-উৎসব, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।

পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ার ফলে বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম চর্চার এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলার নানাস্থানে বৌদ্ধ বিহার গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার খুব প্রসিদ্ধ। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে ঐ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ওদন্তপুর ও বিক্রমশীলা বিহারও খ্যাতি লাভ করেছিল।

ওদন্তপুর বিহার : ওদন্তপুর ছিল বিখ্যাত নালন্দার কাছাকাছি একটি সংঘারাম। হর্ষবর্ধনের পর নালন্দার খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু পাল বংশের সময় ওদন্তপুরের নাম খুব ছড়িয়ে পড়ে। ওদন্তপুর মঠে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পড়ান হত। ওদন্তপুরের গ্রন্থাগার খুব বিখ্যাত ছিল। পালযুগে বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে অধ্যয়ন করবার জন্য বিক্রমপুরের চন্দ্রগর্ভ নামে একজন বাঙ্গালী যুবক ওদন্তপুরে এসেছিলেন। চন্দ্রগর্ভ শীলরক্ষিতের কাছে শিক্ষালাভ করে 'শ্রীজ্ঞান' নামে পরিচিত হন। এই শ্রীজ্ঞান তিব্বত ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ' নামে খ্যাত হয়ে আছেন।

বিক্রমশীলা : বর্তমান ভাগলপুরের কাছে পালরাজ ধর্মপাল একটি মহাবিহার ও একটি মঠ স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই বিহারের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। বিক্রমশীলা বিহারে তিন হাজার ছাত্রের পড়াশুনোর ব্যবস্থা ছিল। এখানে একশো চৌদ্দ-জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। বিক্রমশীলার প্রধান আচার্য ছিলেন শ্রীঅভয় করগুপ্ত নামে বাংলাদেশের একজন পণ্ডিত। বিক্রমশীলা বিহার থেকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ শ্রমণ ও আচার্য তিব্বতে যান। ছাত্রদের শিক্ষা শেষ হলে পাল রাজারা

স্বয়ং উপস্থিত থেকে স্নাতকদের উপাধি দিতেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ বাংলা দেশের সঙ্গে তখন দূর-দূরান্তের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তাম্রলিপ্ত (এখনকার তমলুক) তখন বাংলার বিখ্যাত বন্দর। এখান থেকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বাঙালীদের বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ ভারত

গুপ্তোত্তর যুগের দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাতাপি বা বাদামীর চালুক্য বংশ ছিল শক্তিশালী। চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৯-৬৪২ খ্রীঃ) হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে তাঁর অগ্রগতি রোধ করেন। পুলকেশীর রাজত্বকালে চালুক্য বংশ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যকে পরাভূত করে এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশী শেষ জীবনে কাঞ্চীর পল্লব বংশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

পল্লব বংশ তৃতীয় শতকেই একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে পল্লবরাজ আরও পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে চালুক্য ও পল্লব রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলে। এই বিরোধের ফলে দুটি রাজ্যই ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে রাষ্ট্রকূট বংশ দাক্ষিণাত্যে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে।

দক্ষিণ ভারতের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল তাঞ্জোরের চোল রাজ্য। চোল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলদেব।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প ঃ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজধানী বাতাপী নগরে গিয়েছিলেন।

হিউয়েন সাঙ বলেছেন, দ্বিতীয় পুলকেশীকে প্রজারা ভীষণ ভয় করত, অথচ গভীর শ্রদ্ধাও করত। কথিত আছে, দ্বিতীয় পুলকেশীর খ্যাতি চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং চীন সম্রাট তাই সুঙ-এর সঙ্গে তাঁর পত্র ও উপহার বিনিময় হয়েছিল। চালুক্যদের সময় বাতাপির বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলি এবং আইহোলের দুর্গামন্দির নির্মিত হয়েছিল। অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্রও এই সময়ই অঙ্কিত হয়েছিল।

পল্লবরা তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের বিজয়বাহিনী সিংহলেও প্রবেশ করেছিল। পল্লব বংশ যুদ্ধ-বিগ্রহের থেকে শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির জন্য বেশী বিখ্যাত। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মা স্বয়ং কবি ছিলেন। তাঁর রচিত 'মত্তবিলাস' নামে গ্রন্থটি
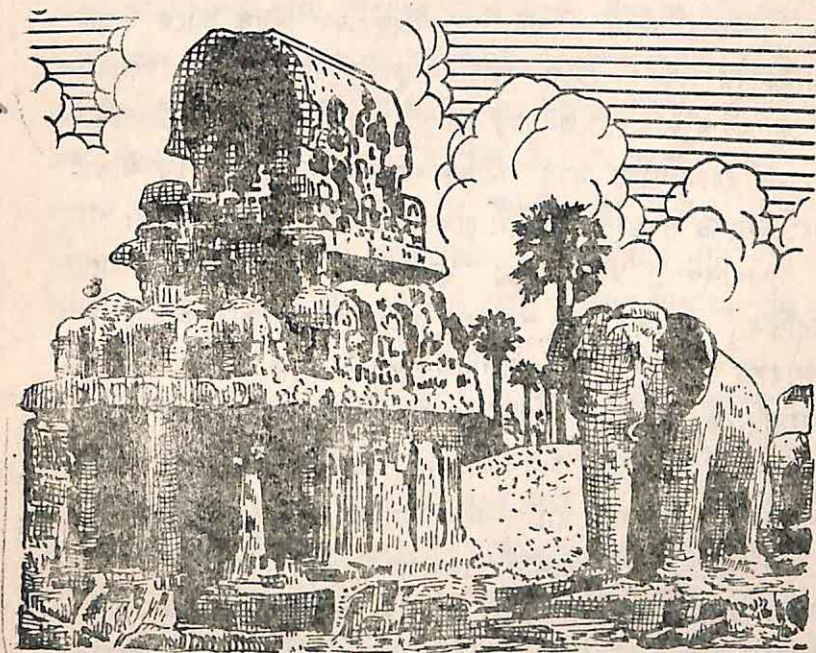
মামল্লপুরের রথ

একটি উপাদেয় ব্যঙ্গ রচনা। পাদুকোটা গুহাগাত্রে আবিষ্কৃত চিত্রাবলী তাঁর রাজত্বকালেই খোদিত হয়েছিল। তাঁর পুত্র মহামল্ল

একটি বন্দর স্থাপন করে নিজের নাম অনুসারে এর নাম রাখেন মহামল্লপুরম বা মামল্লপুরম। তিনি বিরাট শিলাখণ্ড খোদাই করে নানা মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করান। এইগুলি মামল্লপুরের রথ নামে বিখ্যাত। মামল্লপুরে সাতটি আশ্চর্য রথ আছে। একটি মন্দিরের গায়ে বহু কল্পিত চিত্র এবং রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী খোদাই করা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল ধ্যানস্থ অর্জুনের একটি ছবি। এই সব মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য পল্লব যুগের ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় নরসিংহবর্মার সময় কাঞ্চীর বিখ্যাত কৈলাস মন্দির তৈরী হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যে শিল্পরীতির আর এক প্রকাশ চোল শিল্প। চোল মন্দিরগুলির মধ্যে তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের শিবমন্দির বিখ্যাত। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে এবং শীর্ষে আছে একটি গোলাকার পাথর। চোল শিল্পীরা ধাতুমূর্তি নির্মাণেও দক্ষ ছিলেন। তাঞ্জোরের মন্দিরে ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাজেন্দ্র চোলদেবের সময় নির্মিত গঙ্গইকোণ্ড, চোলপুরমের মন্দির এবং জলসেচ ব্যবস্থার মধ্যে সে যুগের অগ্রগতির পরিচয় রয়েছে।

নৌব্যবস্থা: দক্ষিণদিকের রাজ্যগুলি ছিল সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা স্বভাবতই সাহসী ও সুদক্ষ নাবিক হয়ে উঠেছিল। এরা ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকের দ্বীপগুলির সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করত। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে চোল বংশই নৌবাহিনীতে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

তাঞ্জোরের চোল বংশীয় রাজা প্রথম পরন্তক সিংহল আক্রমণ করেন এবং সিংহল দ্বীপে চোল রাজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ অধিকার করেছিল। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সময়ে ভারতীয় রণতরী নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশ অধিকার করেছিল। রাজেন্দ্র চোল পারস্য ও লোহিতসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

অতি প্রাচীনকাল থেকেই জল ও স্থলপথে ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতবাসী পূর্বদিকে জলপথে ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ—সুমাত্রা, যবদ্বীপ (জাভা), বোর্ণিও, শ্যাম, চীন, কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য করত, স্থলপথে উত্তরে খোটান, কচা, খাসগড়, চীন এবং মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে পণ্য আদান-প্রদান করত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশরবাসী জনৈক গ্রীক নাবিকের লেখা বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের জোর বাণিজ্য চলত। বিবরণীটি থেকে আরও জানা যায়, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে তাম্রলিপ্ত, নেলকিন্দা, বারিগাজা, মুজিরিস প্রভৃতি বড় বড় বন্দর ছিল। সেই-সব বন্দর থেকে মুক্তা, দামী পাথর, মসলিন, মসলা, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি পণ্য বিদেশে চালান যেত। রোম ছিল ভারতীয় পণ্যের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম, বিদেশে প্রসার লাভ করে। ভারতীয়রা নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এমনকি তারা বিদেশে সাম্রাজ্য পর্যন্ত স্থাপন করেছিল।

বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বহ্লীক, আর্যস্থান (ইরাক), গান্ধার, কৈলাস, মানস-সরোবর প্রভৃতি নামগুলি ভারতীয় ভাষা ও সভ্যতার প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের পরে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন ইহুদীরা ভারত থেকে আনা কাঠ দিয়ে তাদের জাহাজ তৈরী করত। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর থেকে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। বহ্লীকদেশে (ব্যাকট্রিয়া) গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ায় যাতায়াত আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পশ্চিমে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার প্রভাব ঃ আলেকজাণ্ডারের পর থেকে গ্রীক দর্শনের ওপর ভারতীয় দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব দেখা
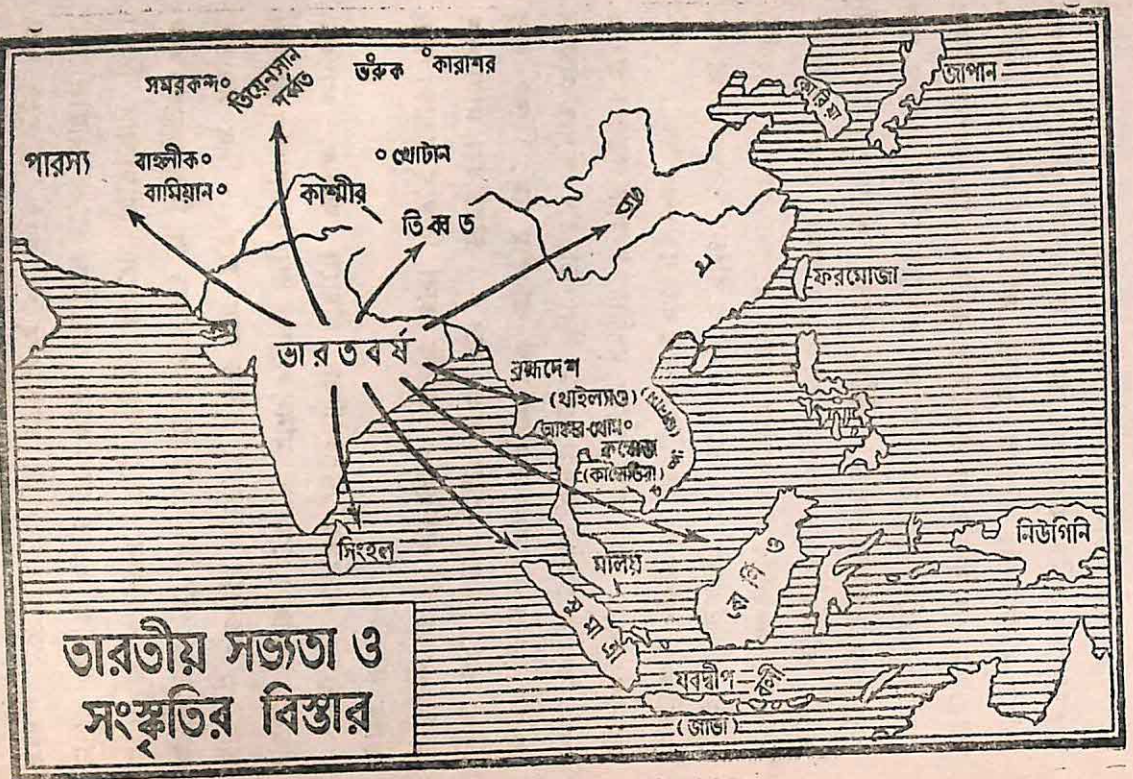
যায়। খ্রীষ্টান মঠ ও মঠবাসীদের জীবনের সঙ্গে ভারতীয় সন্ন্যাস জীবনের অনেক সাদৃশ্য আছে। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে

অনেক মঠ ছিল। সেখানে বুদ্ধমূর্তি পুজোর উল্লেখ আছে। পার্থিয়া দেশ এক সময় পুরোপুরি বৌদ্ধ ছিল। আরবরা ভারত থেকে গণিত, জ্যোতিষ ও দার্শনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল।

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাবঃ কুষাণ যুগে ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া ও চীনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। কাস্পিয়ান সাগর থেকে আরম্ভ করে চীন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হয়। বর্তমান খোটান, কচা, খাসগড়, গোবি মরুভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় নগর ও উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অরেলস্টাইন মধ্য-এশিয়ায় অনুসন্ধান করে অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ ও মঠ, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি এবং অনেক প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলি ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লেখা। মরুভূমির মাঝখানে অবস্থিত 'সহস্র বুদ্ধ' গুহা পরিদর্শনের সময় স্যার অরেলস্টাইন শুনলেন যে, একজন চীনদেশের সন্ন্যাসী ঐ গুহার ভেতরে একটি কক্ষ আবিষ্কার করেছেন এবং সেই কক্ষের ভেতরে একটি গ্রন্থাগার আছে। সেই কক্ষের মধ্যে ছিল প্রচুর পুঁথি। মধ্য-এশিয়ায় তখন মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

চীনঃ মধ্য এশিয়া থেকেই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রচারিত হয়। তারপর সেখান থেকে যায় কোরিয়ায় আর জাপানে। হান বংশের রাজত্বকালে একজন চৈনিক সেনাপতি মধ্য-এশিয়া থেকে একটি মূর্তি চীনে নিয়ে আসেন এবং এই মূর্তির পুজো করেন। এই মূর্তি ছিল গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। চীনা ভাষায় বুদ্ধকে বলা হয় 'ফুট'। পরে তীর্থভ্রমণ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য অনেক চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ই-সিং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশে ফিরে আসবার সময় হিউয়েন সাঙ এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা ভারতবর্ষ থেকে বহু পুঁথিপত্র সঙ্গে করে চীনে নিয়ে যান ও সেগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে তাঁরা আক্রমণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে

বৌদ্ধধর্মের বহু মূল্যবান গ্রন্থ চীন দেশে পাওয়া গেছে। এমনি করেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে চীন দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। চীন দেশে এখনও অনেক বৌদ্ধ আছেন।

তিব্বত: খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পরাক্রান্ত রাজা স্রংসান গাম্পো তিব্বতে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তিনি চীনের তাঙ বংশের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় মহিষী ছিলেন নেপালের রাজকন্যা। এই দুই বৌদ্ধ পত্নীর প্রভাবেই তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলার পাল রাজবংশের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ ছিল। বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে যান। দীপঙ্কর দুর্গম হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে যান এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করে বিশুদ্ধ মহাযান ধর্মমত প্রচার করেন। দীপঙ্কর তিয়াত্তর বছর বয়সে তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন।

সুবর্ণভূমি: চীন ও তিব্বতে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে স্থলপথে। কিন্তু এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপিত হয় জলপথে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোচীন, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জকে ভারতবাসীরা একত্র করে তখন নাম দিয়েছিল 'সুবর্ণভূমি'। এদের ভারতীয় নামকরণ হয়েছিল কম্বোজ, চম্পা, আনাম বা অনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও ইত্যাদি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই ধনধান্যেপূর্ণ সুবর্ণভূমিতে ভারতীয়দের বাণিজ্য তরীগুলি যেত। এর পর ক্রমে ভারতীয়রা এই অঞ্চলে অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করেছিল। মালয়, কম্বোডিয়া, অনাম, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ ও বোর্ণিওতে ভারতীয় রাজাদের নামাঙ্কিত বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে। এই শিলালিপিগুলি থেকে জানা যায় যে, এক সময় এখানে শৈব ও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হয়েছিল। এখানকার হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন।

ইন্দোচীন: কম্বোজ: মধ্যযুগে ইন্দোচীনে দুটি খুব শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল, কম্বোজ (কম্বোডিয়া) এবং চম্পা। কিংবদন্তী অনুসারে মনে হয়, কম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কম্বু স্বয়ম্ভর নামে এক ভারতীয় রাজা। তাঁর নাম থেকে কম্বোজ নাম হয়েছে অথবা এখানে খুব কম্বু বা শঙ্খ পাওয়া যেত বলে এই দেশের নাম কম্বুজ বা কম্বোজ হয়েছে। কম্বোজ রাজ্যের হিন্দু রাজারা নয়শো বছর ধরে মহা আড়ম্বরে রাজত্ব করেন। কালক্রমে কম্বোজ এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বর্তমান কম্বোডিয়া, কোচিন, চীন, শ্যাম, লাওস ও ব্রহ্মদেশ এবং মালয়ের কিছু অংশ কম্বোজের অন্তর্গত ছিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী পাদ্রী কম্বোজের প্রাচীন রাজধানী আঙ্কোরথোম আবিষ্কার করেন। এই নগরের প্রাচীন নাম যশোধরপুর। ৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যশোধর্মণ এই নগর স্থাপন করেন। একজন চীনা পর্যটকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে নগরটি ছিল চতুষ্কোণ। নগরটি দুই মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রশস্ত ছিল। নগরটির চারদিক একটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল এবং তার বাইরে ছিল দশ-কুড়ি হাত চওড়া পরিখা। শহরে ছিল বিশাল বিশাল তোরণ ও স্তম্ভ। পাঁচটি প্রশস্ত রাজপথ শহরের প্রত্যেক সীমা থেকে মাঝখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অসংখ্য মন্দির এবং সরোবর এই শহরের শোভাবর্ধন করত। দশম শতাব্দীতে যশোধরপুর ছিল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর নগর।

নগরের মাঝখানে ছিল বেয়নের সুন্দর শিবমন্দির। বিরাট পিরামিডের মত দেখতে এই মন্দিরের মাঝখানের চূড়াটি ছিল প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু। এই মন্দিরটিতে প্রায় চল্লিশটি গম্বুজ আছে। প্রতিটি গম্বুজের শীর্ষদেশ ধ্যানরত শিবমূর্তির আকারে গঠিত। মন্দিরের গায়ে অঙ্কিত ছিল ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত চুয়াল্লিশটি বিরাট দেবমূর্তি। মন্দিরের তোরণের পাশে ছিল একটি যাট ফুট দীর্ঘ নাগমূর্তি এবং সম্মুখে ছিল দুটি বিরাট গজমুণ্ড। মন্দিরের দেবতা

ছিলেন বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতেশ্বর। এই সমস্ত মন্দিরের গায় বেদ ও পুরাণ থেকে নেওয়া বহু শ্লোক খোদিত আছে। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম সমানভাবে প্রচারিত হয়েছিল।

কম্বোজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আঙ্কোরথোমের দক্ষিণে এক মাইল দূরে আঙ্কোরভাট মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত পাথরের মন্দির নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়।

আঙ্কোরভাটের মন্দির

সূর্যবর্মণ (১১১২-১১৬০ খ্রীঃ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আঙ্কোর-ভাটের প্রধান দেবতা বিষ্ণু। এই মন্দিরে নটরাজ শিব, কিরাতবেশী মহাদেব ও অর্জুনের দৃশ্য খোদিত আছে। এখানে প্রথমে শিবের পুজো হত, পরে বিষ্ণুর পুজোও হতে থাকে। অপূর্ব কারুকার্যযুক্ত এই বিরাট মন্দিরটি ছিল নানাস্তরে সাজান। অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে এবং বহু অলিন্দ ও চত্বর পার হয়ে প্রধান মন্দিরটিতে পৌঁছান যেত। ভাস্করের সুনিপুণ হাতে এখানে রামায়ণের কাহিনী, পৌরাণিক কথা ও মহাভারতের গল্পগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

চম্পাঃ কম্বোজের মত চম্পাও ছিল হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। কথিত আছে, চাঁদ সদাগরের চম্পা (বর্তমান বিহারের ভাগলপুর জেলা) থেকে একদল বণিক অথবা নির্বাসিত রাজপুত্র বর্তমান আন্নাম অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন

করেছিলেন। তাঁদের মাতৃভূমির নাম অনুসারে তাঁরা এই দেশের নাম দিয়েছিলেন চম্পা। এখানকার রাজারা তেরশো বছরেরও বেশী রাজত্ব করেছিলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রতিবেশী রাজ্য কম্বোজ ও মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। কম্বোজের মতই চম্পাও ছিল বৌদ্ধমঠ ও হিন্দুমন্দিরে পূর্ণ। এখানকার মন্দিরে শিব, শক্তি (দুর্গা), গণেশ, স্কন্দ (কার্তিক) এবং বিষ্ণুমূর্তি খোদিত আছে।

সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি: সুমাত্রার সভ্যতা ছিল বৌদ্ধপ্রধান এবং যবদ্বীপের সভ্যতা ছিল হিন্দু-প্রধান। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এখানকার সভ্যতা বহু নিদর্শন নষ্ট হয়ে গেছে। যবদ্বীপে বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। শোনা যায়, ভারতীয় ঋষি অগস্ত্য যবদ্বীপে গিয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজপুত্র গুণবর্মণ যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কথিত আছে, কলিঙ্গ থেকে কুড়ি হাজার পরিবার এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন সিংহল থেকে চীনে ফেরার পথে (৪১৪ খ্রীঃ) যবদ্বীপে পাঁচ মাস কাটান। কাঞ্চীর ধর্মপাল এবং বাংলার অতীশ দীপঙ্কর সুমাত্রা দ্বীপে কয়েক বছর ছিলেন। মালাক্কা দ্বীপের রাজা শ্রীবিজয় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ফিলিপাইনের প্রাচীন ভাষার রূপ অনেকটা সংস্কৃতের মত।

শৈলেন্দ্র রাজবংশ: খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজবংশ সমস্ত মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপগুলি নিয়ে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শৈলেন্দ্র নাম থেকে বোঝা যায় যে এই রাজবংশ আসলে একটি ভারতীয় রাজবংশ। চীনের কাহিনীতে শৈলেন্দ্র বংশকে শানফুৎসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত ও চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। শৈলেন্দ্রদের অধীনে পনেরটি করদ রাজ্য ছিল। আরব বণিকরা এই সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঐশ্বর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। একজন আরব বণিক লিখেছেন, মহারাজার দৈনিক আয় ছিল দুশো মণ সোনা। তিনি প্রতিদিন

সকালে একটি হ্রদে জলদেবতার উদ্দেশ্যে সোনার তৈরী নিরেট একটি ইট ফেলতেন।

শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের এক শক্তিশালী নৌবহর ছিল। প্রতিবেশী সমস্ত রাজ্য তাঁদের কাছে বারবার পরাজয় স্বীকার করেছে। এখানকার রাজারা ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধ। কুমার ঘোষ নামে এক-জন বাঙালী পণ্ডিত এখানকার রাজগুরুর পদ লাভ করেছিলেন। মহারাজ বালপুত্রদেব ভারতের নালন্দাতে এক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করান। তিনি বাংলার পাল সম্রাট দেবপালের কাছে দূত পাঠান এবং তাঁকে ঐ বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করতে অনুরোধ করেন। দেবপাল তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

শৈলেন্দ্রবংশীয় প্রত্যেক রাজাই শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দুদের বৃহত্তম মন্দির মালয়ে এবং বৌদ্ধদের বৃহত্তম মঠ যবদ্বীপে আবিষ্কৃত হয়েছে। যবদ্বীপের মাঝখানে ছোট্ট পাহাড়ের ওপর বরবুদুরের ছয়তলা মন্দির অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র
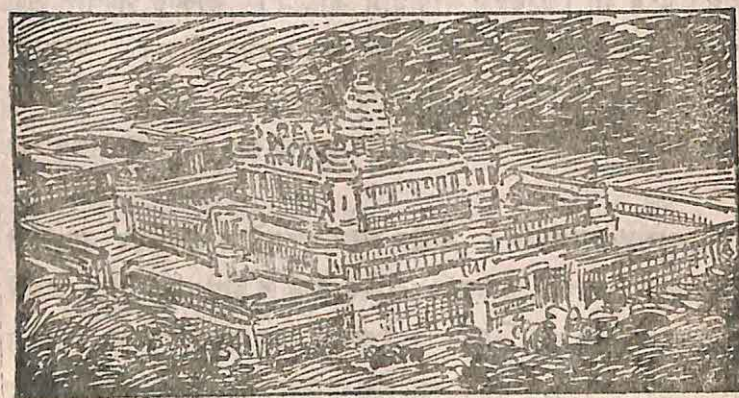
বরবুদুরের মন্দির

বংশের রাজত্বকালে তৈরী হয়েছিল। এই মন্দির পর পর ছয়টি স্তরে নির্মিত। বরবুদুর মন্দিরের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ বৌদ্ধ তারাদেবী। এখানে ধ্যানরত বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। জাতকের কাহিনীগুলি মন্দিরের গায়ে খোদিত দেখা যায়। বরবুদুর শিলালিপির অক্ষরগুলি

ভারতীয়। শৈলেন্দ্র বংশের পতনের পর হিন্দুরা আবার বরবুদুরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি খোদিত করেছিল। বরবুদুরের গায়ে রামায়ণের প্রায় সব গল্পই আঁকা আছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সীতার বিবাহ, সীতা হরণ, বানর সৈন্যের লঙ্কায় অবতরণ, হনুমানের লঙ্কা-দহন, রাম রাবণের যুদ্ধ, সীতা উদ্ধার ইত্যাদি ছবিগুলি।

যবদ্বীপে দেশীয় ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করা হয়েছিল। আজও সেখানকার অধিবাসীরা এই মহাকাব্য দুখানি পড়ে আনন্দলাভ করে।

সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশেও যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল তার প্রমাণ আমরা এই সব অঞ্চলের মন্দিরগুলিতে দেখতে পাই।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত যে কত উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে এশিয়ায় অবস্থিত ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি। ভারত ও চীনের সম্পর্ক ছিল অতি গভীর ও সুপ্রাচীন। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ভারত চীনের কাছে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। চীনের মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সামাজিক নিয়ম-কানুন, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত এশিয়ার বুকে এক বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু আজও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব দেখা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তুর্কীজাতির উত্থান : ভারতে সুলতানী শাসন

আরবরা যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা হারুণ-অল-রশীদের মৃত্যুর কিছুকাল পর থেকে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। শেষে অবস্থা এমন হল যে, আব্বাসীয় খলিফাদের কোন ক্ষমতাই আর থাকল

না। পশ্চিমে আরব সর্দাররা অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেছিল। পূর্বে পারসিক এবং তুর্কীজাতি কয়েকটি রাজ্য গঠন করল। বাগদাদের খলিফা নামেমাত্র ইসলামের নায়কের পদে রইলেন।

তুর্কীরা মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্থানে বাস করত। ক্রমে তারা অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আরবদের সংস্পর্শে এসে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারপর তারা খলিফাদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কালক্রমে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে নেয়। আরবদের পরে বিভিন্ন তুর্কীজাতির মধ্য দিয়েই আবার ইসলামী শক্তি ও সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে আলপ্তগীন নামে একজন তুর্কী বীর আফগানিস্তানে স্বাধীন গজনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসন লাভ করেন। সুশাসক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বাগদাদের খলিফা তাঁকে স্বাধীন সুলতান বলে স্বীকার করলেন। তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

সেলজুক তুর্কীঃ সুলতান মামুদের রাজত্বকালে আর একদল তুর্কী তাঁর রাজ্যের সীমান্তে বাস করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে এরা পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ঐ দলের নেতার নাম ছিল সেলজুক। সেলজুকের নাম থেকেই ওদের বলা হয় সেলজুক তুর্কী। মামুদের এক পুত্রকে পরাজিত করে তারা পারস্য দেশ অধিকার করেছিল। তখন থেকেই সেলজুক তুর্কীদের আধিপত্য শুরু হয়। তারপর ক্রমে তারা তুর্কীস্থান থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে। সেলজুকরা জেরুজালেম অধিকার করাতে ক্রুসেড যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। এই সেলজুক বংশেরই সুলতান সালাদিন ধর্মযুদ্ধে খ্রীষ্টানদের পরাজিত করেছিলেন। সেলজুক সুলতানরা শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। সুলতান সালাদিনের রাজত্বকালে কবি ওমর খৈয়াম তাঁর বিখ্যাত রুবায়েৎগুলি রচনা করেছিলেন।

খোয়ারিজম রাজ্যঃ সেলজুক তুর্কীরা যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল

তখন আর একটি তুর্কী বংশ খোয়ারিজম বা খিবায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। বর্তমান বোখারা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে খোয়ারিজম রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। সেলজুকদের অধিকৃত পূর্বদিকের কতগুলি স্থান দখল করে তারা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্রায় এই সময়েই তুর্কীদের আর একটি দল উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এদের নেতা ছিলেন মহম্মদ ঘুরী। তিনি আফগানিস্তানের ঘুর প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।

মুসলমানদের ভারত আক্রমণ : বহুদিন থেকেই ভারতবর্ষ আরবদের কাছে পরিচিত ছিল। ভারতের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকদিন ধরেই চলত। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকেই আরবরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিন্ধুদেশ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থান দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ইরাকের শাসনকর্তা অল-হজ্জাজের শাসনকালে সিন্ধুদেশের উপকূলে দেবল নামে এক জায়গায় আরবদের একটি বাণিজ্য-জাহাজ লুঠ হয়। তখন সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহির। অল-হজ্জাজ দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করলে অল-হজ্জাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বিন-কাশিমের নেতৃত্বে দাহিরের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান। যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হন। সিন্ধু আরবদের হস্তগত হয়। আরবদের এই জয়ের ফলে সিন্ধু অঞ্চলে মুসলিম উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে সিন্ধুদেশের ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা আরম্ভ হয়।

সুলতান মামুদ : আরব-বিজয়ের প্রায় তিনশো বছর পরে গজনীর সুলতান সবুক্তগীন পাঞ্জাবের রাজা জয়পালকে পরাজিত করেন। সবুক্তগীনের পর সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন। তিনি সতের বার ভারত আক্রমণ ও লুঠ করেছিলেন। মামুদ কিন্তু রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করেননি। তাঁর অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অতুল ধনরত্ন লুঠ করা। মূলতান, থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা প্রভৃতি মধ্যযুগের বড় বড় শহর এবং গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথের

মন্দির লুঠ করে তিনি অজস্র ধনরত্ন গজনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুলতান মামুদ শুধুমাত্র পাঞ্জাব নিজের অধিকারে রেখেছিলেন। সুলতান মামুদের সঙ্গে আলবেরুনি নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এসেছিলেন।

মহম্মদ ঘুরী ঃ ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজ্য স্থাপন করেন মহম্মদ ঘুরী। মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের অবনতি হতে থাকে। তখন ঘুরের সুলতানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এই রাজ্যটি ছিল গজনীর পশ্চিমে। মহম্মদ ঘুরী নিজের বাহুবলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান রাজাদের পরাজিত করে মূলতান, পেশোয়ার ও লাহোর জয় করেন। কিন্তু তিনি এখানেই নিরস্ত হলেন না। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ঐ সময় উত্তর ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। বিশেষ করে দিল্লী ও আজমীরের চৌহানবংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কনৌজের রাঠোরবংশীয় রাজা জয়চন্দ্রের ছিল ঘোর শত্রুতা। রাজপুত রাজাদের এই অনৈক্যের ফলেই মহম্মদ ঘুরীর পক্ষে ভারত জয় করা সম্ভব হয়েছিল।

গল্প আছে যে, জয়চন্দ্র একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন এবং পৃথ্বীরাজকে অপমান করার জন্য তাঁর একটি মূর্তি তৈরী করে সেটিকে দ্বারপালের মত দরজার কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এই যজ্ঞসভাতেই জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের মূর্তিকেই স্বামীরূপে বরণ করেন। পৃথ্বীরাজ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে সংযুক্তাকে হরণ করেন।

১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করলেন। পৃথ্বীরাজও এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। পাণিপথের কাছে তরাইনের উভয় পক্ষে যুদ্ধ হল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মহম্মদ ঘুরী ফিরে গেলেন। পরের বছর মহম্মদ ঘুরী আবার তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হলেন। এরপর মহম্মদ ঘুরী তাঁর একজন বিশ্বাসী ও সুযোগ্য

ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবককে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। পরে কুতুবউদ্দিন আরও নতুন নতুন রাজ্য জয় করলেন। কুতুবউদ্দিনের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বিন বক্তিয়ার খলজি বিহার ও বাংলায় মুসলমান অধিকার বিস্তার করেন। অপুত্রক মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হলে কুতুবউদ্দিনই দিল্লীর সুলতান হন। তাঁর সময় থেকেই ভারতে তুর্কী শাসনের সূত্রপাত হয়।

দাস বংশ: কুতুবউদ্দিন ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁর পরবর্তী কয়েকজন সুলতানও ক্রীতদাস ছিলেন। সেই জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুলতান বংশকে বলা হয় 'দাস বংশ'। কুতুবউদ্দিনই ছিলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান। মাত্র চার বছর রাজত্ব করার পর একদিন পোলো খেলবার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। কুতুবউদ্দিন খুব সাহসী যোদ্ধা ও সুদক্ষ সুলতান ছিলেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুতুব মিনারের নির্মাণকার্য তিনিই আরম্ভ করেন। কুতুব নামে একজন মুসলমান সাধুর স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

কুতুবমিনার

ইলতুৎমিস: কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর আরামশাহ সুলতান হন। তিনি ছিলেন অপদার্থ। দিল্লীর আমীর ওমরাহরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে ইলতুৎমিসকে সুলতান ঘোষণা করেন। প্রথম জীবনে ইলতুৎমিসও একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে কুতুবউদ্দিন তাঁকে কেনেন এবং পরে নিজের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। ইলতুৎমিসের সিংহাসন আরোহণের সময় ভারতে মুসলমান রাজত্বের বড় সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। কুতুবউদ্দিনের পর দেশের চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

সিন্ধু ও বাংলাদেশের শাসন কর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গজনীর সুলতানও পাঞ্জাব অধিকার করার চেষ্টা করেন। ধীর ও বিচক্ষণ ইলতুৎমিস বেশ যোগ্যতার সঙ্গে সাম্রাজ্যকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করে আরও শক্তিশালী করে তুললেন। তাঁর সময়ে মোঙ্গলরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। চেঙ্গিজ খাঁ এই সময় খোয়ারিজমের এক রাজপুত্রকে অনুসরণ করে ভারত সীমান্তে এসে ছিলেন। ইলতুৎমিস পলাতক রাজপুত্রকে আশ্রয় না দেওয়ায় চেঙ্গিজ খাঁ আর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করেই ফিরে যান।

ইলতুৎমিস বাংলা দেশ ও গোয়ালিয়র জয় করেন। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে প্রায় সমস্ত ভারত তাঁর অধিকারে আসে। ইলতুৎমিস বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে 'সুলতান ই-আজম' উপাধি লাভ করেন। সুলতানী শাসনের ভিত্তি কুতুবউদ্দিন স্থাপন করেন, কিন্তু সেই ভিত্তিকে দৃঢ় করেন ইলতুৎমিস। তিনি ছিলেন একাধারে বীর যোদ্ধা, দূরদর্শী শাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য ইলতুৎমিসই শেষ করেছিলেন।

রিজিয়াঃ ইলতুৎমিসের পুত্র রুকনউদ্দিই অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাই ইলতুৎমিস তাঁর কন্যা রিজিয়াকে উপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁকে সিংহাসন দিয়ে যান। রিজিয়াই ছিলেন একমাত্র নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। রিজিয়া সাহসী ও সুশাসক ছিলেন। পুরুষের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি প্রতিদিন রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু কয়েকজন আমীর-ওমরাহ স্ত্রীলোকের এই শাসন মানতে রাজী হলেন না। তারা বিদ্রোহ করলেন। শেষ পর্যন্ত রিজিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারালেন।

নাসিরউদ্দিন মামুদঃ রিজিয়ার মৃত্যুর পর কিছুদিন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা চলল। শেষে ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র শান্তিপ্রিয়, ধার্মিক ও দুর্বল নাসিরউদ্দিন মামুদ সুলতান হন। মন্ত্রীদের হাতে রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে তিনি ধর্মচর্চাতেই দিন কাটাতেন। গল্প আছে যে, রান্না

করতে গিয়ে একবার তাঁর বেগমের হাত পুড়ে যায়। বেগম তখন নাসিরউদ্দিনকে একটি বাঁদী রেখে দিতে বলেন। কিন্তু সুলতান রাজী হননি। তিনি বলেছিলেন যে, রাজকোষের সমস্ত অর্থ প্রজার, নিজের জন্য ব্যয় করার অধিকার তাঁর নেই।

দরিদ্রের প্রতি তাঁর অসীম করুণা ছিল। কোরাণ নকল করে তিনি যা আয় করতেন তা দিয়েই কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

বলবন ঃ নিঃসন্তান নাসিরউদ্দিন মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তাঁর শ্বশুর গিয়াসউদ্দিন বলবন সুলতান হন। বলবনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। পরে অধ্যবসায় এবং ভাগ্যের জোরে তিনি উন্নতি লাভ করেন।

বলবন রাজ্যে আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি মোঙ্গল আক্রমণ রোধ করার জন্য সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ করেন। ন্যায় বিচারক হিসাবে বলবনের অসামান্য খ্যাতি ছিল। বলবনের সময় দিল্লী শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সুপ্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু বলবনের সভাকবি ছিলেন। মোঙ্গলদের আক্রমণে রাজ্যহারা হয়ে মধ্য-এশিয়ার কয়েকজন রাজা ভারতবর্ষে পালিয়ে আসেন। বলবন তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

খলজি বংশ ঃ আলাউদ্দিন খলজি ঃ বলবনের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় হলেও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর পরবর্তী সুলতান কাইকোবাদ ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দিন খলজি নামে এক সেনাপতি দিল্লী অধিকার করে খলজি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান হন।

আলাউদ্দিন খলজিই ছিলেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি যুদ্ধ করে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ নিজের অধিকারে এনেছিলেন। আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করে বাঘেলাবংশীয় রাজা কর্ণের পত্নী কমলা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। রণথম্ভোর ও চিতোরও

আলউদ্দিনের অধিকারে আসে। এরপর তিনি উত্তর ভারতে মালব, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, চন্দেরী, ধারা প্রভৃতি জয় করেন। তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র এবং মাদুরার পাণ্ডুরাজ্য জয় করেন। কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এইভাবে আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম ভারতবর্ষব্যাপী এক বিশাল মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলাউদ্দিন খলজি

এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আলাউদ্দিনের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। সৈন্যবাহিনীর খরচ চালাবার জন্য তিনি এক অভিনব উপায় গ্রহণ করেন। তিনি বাজারের সমস্ত জিনিসের দাম বেঁধে দিলেন। কোন ব্যবসায়ী যদি নির্দিষ্ট দর থেকে বেশী দামে জিনিস বিক্রী করত, তবে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। এই কঠোরতার জন্য ব্যবসায়ীরা ন্যায্য দরেই জিনিস বিক্রী করত। রাজ্যে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র নিবারণ করার জন্য তিনি ওমরাহদের একত্রে মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন। হিন্দু প্রজাদের তিনি খুব পীড়ন করতেন। মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ হল। তিনি নিজে মদ পান করা বন্ধ করলেন। আলাউদ্দিন গুপ্তচরদের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অংশের খবর নিতেন। তাঁর কঠোর শাসনে দেশে বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হলেও আলাউদ্দিন ছিলেন চরম স্বেচ্ছাচারী, নির্মম ও নৃশংস। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই খলজি বংশের পতন হয়।

তুঘলক বংশ : মহম্মদ বিন তুঘলক : আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর কিছুদিন ভয়ানক অরাজকতা চলেছিল। অবশেষে গিয়াসউদ্দিন

তুঘলক নামে এক সেনাপতি দিল্লীর সুলতান হন এবং দিল্লীতে তুঘলক-বংশের রাজত্ব শুরু হয়।
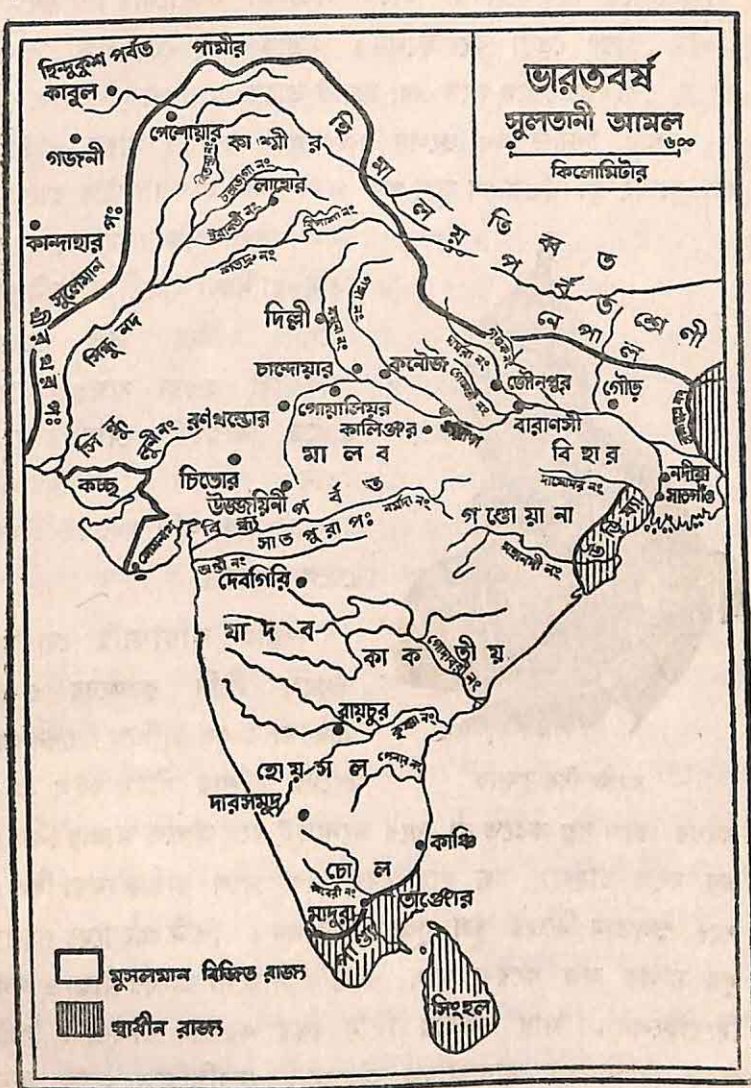
এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল জোনা খাঁ। অনেকে মনে করেন, মহম্মদ বিন তুঘলক কৌশলে তাঁর পিতা গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা

করেছিলেন। একবার এক বিদ্রোহ দমন করে গিয়াসউদ্দিন রাজধানীতে ফিরছিলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মহম্মদ একটি তোরণ তৈরী করেছিলেন। সম্রাট সেই তোরণ অতিক্রম-কালে তোরণটি ভেঙ্গে পড়ে এবং সম্রাট তাতে চাপা পড়ে মারা যান।

মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মত অসাধারণ পণ্ডিত সে যুগে খুব কমই দেখা যায়। তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত সুন্দর। তিনি ধার্মিক, সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন। কিন্তু এত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে কয়েকটি দোষ ছিল। তিনি অত্যন্ত খামখেয়ালী ছিলেন এবং অতি সহজেই ভীষণ রেগে যেতেন।

মহম্মদ বিন তুঘলক

দিল্লীর কাছাকাছি দোয়ার অঞ্চলে তিনি কৃষকদের ওপর এমনভাবে কর চাপিয়ে দিলেন যে তাদের দুর্দশার সীমা রইল না। করের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেকেই বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। এর ফলে চাষবাস বন্ধ হয়ে গেল এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। পরে সুলতান নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি প্রজাদের দুর্দশা দূর করার জন্য কয়েক মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে তাদের খাদ্য ও অর্থ দিয়েছিলেন। আর একবার তিনি স্থির করলেন রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করবেন। দেবগিরিতে একটি নতুন শহর তৈরী করা হল এবং নাম রাখা হল দৌলতাবাদ। সুলতান দিল্লীর সমস্ত নাগরিককে জোর করে দৌলতাবাদে নিয়ে গেলেন। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদের দূরত্ব ছিল প্রায় সাতশো মাইল। এই দীর্ঘ পথ যেতে শত শত লোক প্রাণ হারাল। কয়েক বছর পরে

নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুলতান রাজধানী আবার দিল্লীতে নিয়ে আসেন।

খামখেয়ালী সুলতানের একবার ইচ্ছা হল তিনি পারস্য জয় করবেন। পারস্য জয় করার জন্য তিনি এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করলেন। কিন্তু এক বছর পর তিনি এই পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। এতে বহু অর্থ নষ্ট হল। আর একবার হিমালয় পর্বতমালার মাঝে কারাজল রাজ্যটি জয়ের জন্য তিনি সৈন্য পাঠালেন। হিমালয়ের দুর্জয় শীতে এবং খাদ্যাভাবে সৈন্যদের অধিকাংশই মারা পড়ল।

তখন চীনদেশে তামার নোটের প্রচলন ছিল। মহম্মদ ঠিক করলেন, ভারতে তামার নোট চালাবেন। তামার নোট চালু হল। কিন্তু পরে দেখা গেল, সারা দেশ জাল তামার নোটে ছেয়ে গেছে। তিনি তামার নোট বন্ধ করলেন। তামার নোটের বদলে তিনি রাজকোষ থেকে সোনা ও রূপার মুদ্রা দিলেন। এতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গেল। মহম্মদের রাজত্বের শেষ দিকে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুলতান বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে সিন্ধু দেশে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হল।

ফিরুজ তুঘলক ঃ মহম্মদের পর তাঁর এক জ্ঞাতি ফিরুজ শাহ সুলতান হন। তিনি দয়ালু, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি বহু প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহর তাঁরই কীর্তি। তিনি রাজস্বের হার কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং কঠোর শাস্তিদান প্রথা তুলে দিয়েছিলেন। পান্থশালা, চিকিৎসা কেন্দ্র, শিক্ষালয় স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কাজও তিনি করেছিলেন। শহরে জল সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থার জন্য তিনি যে খালগুলি খনন করেছিলেন তা আজও পাঞ্জাবের কিছু অংশে দেখা যায়। ইসলাম ধর্মে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল।

ফিরুজ তুঘলকের মৃত্যুর পর (১৩৮৮) রাজ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তুঘলক বংশের শেষ সুলতাম মামুদ শাহ-এর রাজত্বকালে তুর্কী

নেতা তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পদ, মণি-মাণিক্য নিয়ে সমরখন্দে ফিরে যান।

সৈয়দ বংশ ঃ তুঘলক বংশের রাজত্বের পর অল্পকালের জন্য (১৪১৪—১৪৫১) দিল্লীতে সৈয়দ বংশের শাসন শুরু হয়। নিজেদের হজরত মহম্মদের দৌহিত্র বংশ বলে পরিচয় দিতেন বলেই এঁদের 'সৈয়দ' বলা হয়। খিজির খাঁ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

লোদী বংশ ঃ ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ বংশকে উচ্ছেদ করে দিল্লীতে এক নতুন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন পাঞ্জাবের আফগান শাসন-কর্তা বহলুল লোদী। বহলুল লোদীর পর সিকন্দর লোদী সুলতান হন। লোদী সুলতানের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদী সুলতান হন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তিনি মুঘল নেতা বাবরের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল শাসনের শুরু হয়।

উত্তর ভারতে দিল্লীর সুলতানী নিয়ে আমীর ওমরাহদের বিবাদের মধ্যে এই সময় দক্ষিণ ভারতে বাহমনী ও বিজয় নগর নামে দুটি সমৃদ্ধ রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

তুর্ক-আফগান যুগে ভারতবর্ষ

সমাজ ও ধর্ম ঃ তুর্ক-আফগান সুলতানরা প্রায় তিনশো বছর দিল্লীতে রাজত্ব করেন। দীর্ঘকাল পাশাপাশি একত্রে বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসে। অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং বহু মুসলমান হিন্দু কন্যা বিবাহ করে। এর ফলে এদেশের মুসলমানরা অনেক পরিমানে হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ করে এবং হিন্দুধর্ম ও চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। মুসলমানরা ভারতবর্ষে এক নতুন সংস্কৃতি বহন করে আনে। ক্রমে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নবাগত মুসলমান

সংস্কৃতির ধারার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এবং সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই সমন্বয় দেখা যায়। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মিলনের জন্য এই যুগে কয়েকজন শক্তিশালী ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়। এই সব ধর্মগুরুর মধ্যে রামানন্দ, কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কবীর

কবীর ছিলেন রামানন্দের একজন প্রধান শিষ্য। কবীর কবে ও কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এক জোলা পরিবারের সন্তান বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য মানতেন না। তিনি বলতেন, হিন্দুর পরমেশ্বর এবং মুসলমানের আল্লা একই।

নানক জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দি (বর্তমান নানকানা) নামক স্থানের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নানক মানতেন না। গল্প আছে, মক্কায় কাবা শরিফের দিকে পা রেখে শোবার জন্য একজন মোল্লা তিরস্কার করায় উত্তর দিয়েছিলেন, কোন দিকে আল্লাহ নেই বলুন। এতে মোল্লা খুব লজ্জিত হলেন। নানকও কবীরের মত প্রেমধর্ম প্রচার করেছেন। তাঁর অনেক মুসলমান শিষ্য ছিল। নানকের শিষ্যরা শিখ নামে পরিচিত।

নানক

শ্রীচৈতন্য বাংলা দেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছেন। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানতেন না। জীবে দয়া ও ভগবানে প্রেম, এই ছিল তাঁর ধর্মের মূল কথা।

শ্রীচৈতন্য

সাহিত্য ঃ এই যুগে প্রাদেশিক স্থলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। স্থলতানী যুগে বাংলা, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উন্নতি হয়। ফার্সী ও হিন্দীর মিশ্রণে উর্দু ভাষার প্রচলনও এই সময়ে হয়। এই যুগের মুসলমান লেখক আমীর খসরু ছিলেন একাধারে কবি, ঐতিহাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলী সাহিত্য, কবীরের দোঁহা, তুকারাম ও নামদেবের রচনাবলী, আমীর খসরুর স্থললিত হিন্দী ও উর্দু কবিতা পৃথিবীর যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের সমতুল্য।

মিনহাজউদ্দিন, জিয়াউদ্দিন বরনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা স্থলতানী আমলের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রচনা করেছেন। ইবন বতুতা, আবদুর রজ্জাক, নিকিতিন প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের লেখা থেকেও তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

শিল্প ঃ মুসলমান স্থলতানরা শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। মিনার, গম্বুজ, জাফরির কাজ প্রভৃতি মুসলমানরাই এদেশে প্রবর্তন করেছে। মুসলমানরা প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণের জন্য

ভারতীয় শিল্পী ও স্থপতি নিয়োগ করেছে। কখনও কখনও হিন্দুদের মন্দিরগুলিকে কিছু পরিবর্তন করে মসজিদে পরিণত করা হত। এই-ভাবে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য রীতির মিশ্রণে এক নতুন স্থাপত্য শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে গৌড়, উত্তর প্রদেশে জৌনপুর এবং গুজরাটের আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এই মিশ্ররীতিতে গড়া অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারৎ আজও দেখতে পাওয়া যায়। কুতুবমিনার, আলাই দরওয়াজা ও ফিরোজ শাহের সমাধি মন্দির সে যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অর্থ নৈতিক জীবন ঃ সুলতানী যুগে সুলতান, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও আমীর-ওমরাহরা ঐশ্বর্য ও বিলাসে জীবন যাপন করতেন, আর সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যে ডুবে থাকত। আমীর খসরু বলেছেন, রাজার মুকুটের এক একটি মুক্তো দরিদ্র্যের এক এক ফোঁটা চোখের জল দিয়ে তৈরী। চাষবাস করাই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা হলেও সুলতানী আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে।

সামাজিক অবস্থা ঃ সুলতান, রাজা, আমীর-ওমরাহ ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী রাখতেন। চীন, তুর্কীস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বহু ক্রীতদাস আমদানি করা হত।

সমাজ ছিল পুরুষ শাসিত। সমাজে সম্মান থাকলেও মেয়েরা ছিল পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। 'বাল্য-বিবাহ' এ সময়ে প্রচলিত ছিল।

সুলতানী আমলে বাংলা ঃ ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশ জয় করে দিল্লীর সুলতানের অধীনে আনলেও আসলে বাংলা প্রায় স্বাধীনই ছিল। মুসলমান শাসকরা নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পাঠিয়ে দিলে সুলতানরা তাঁদের কাজে কোন হস্ত-ক্ষেপ করতেন না। মহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে বাংলা পুরোপুরি স্বাধীন হয়।

ইলিয়াস শাহ : ইলিয়াস শাহ ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার অধীশ্বর হন। ইলিয়াস শাহের শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ইলিয়াস শাহী বংশের রাজারা প্রায় দেড়শো বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন।

রাজা গণেশ : গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে দিনাজপুর ও ভাতুড়িয়ায় গণেশ নামে এক ব্রাহ্মণ জমিদার খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি মুসলমান শক্তিকে পরাজিত করে কিছুদিন বাংলা শাসন করেন। গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন মামুদ শাহ নাম গ্রহণ করেন।

হুসেন শাহ : হাবসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার রাজ-কর্মচারী ও সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়। শেষে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হাবসী রাজাকে বিতাড়িত করে বাংলার অধীশ্বর হন। হুসেন শাহ-ই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। হুসেন শাহ উদার এবং জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। বহু হিন্দু তাঁর অধীনে উচ্চ রাজপদ লাভ করেছিল।

হুসেন শাহের বংশ বাংলাদেশে বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেনি। বিখ্যাত পাঠান সম্রাট শের শাহ হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতানকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করেন।

সুলতানী আমলে বাংলার অবস্থা : হিন্দু ও মুসলমান দীর্ঘদিন একত্রে বাস করায় ভারতে এক নতুন জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। বাংদেশেও এই নতুন জাতীয় ধারার এক বিচিত্র বিকাশ ঘটে। বাংলার হিন্দুরা মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। আবার মুসলমানরাও হিন্দুদের আচার ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্মের দিক দিয়েও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও মিলন ঘটে। হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের ফলেই সত্যপীরের পুজোর প্রচলন হয়েছে।

এই যুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলার ধর্ম ও সমাজের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার কবিদের মধ্যে মুকুন্দরাম

বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর লেখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সে কালের সাধারণ বাঙালী ঘরের সুখ দুঃখের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলনান শাসনকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব বিকাশ ঘটে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলা ভাষার সম্পদ। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের লেখা রামায়ণ ও মহাভারত আজও বাংলার ঘরে ঘরে পড়া হয়। হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ ও ইউসুফ শাহ প্রভৃতি সুলতানরা বংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এ যুগের কবি মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।

এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। এখানকার টোলে বড় বড় পণ্ডিতরা অসংখ্য বিদ্যার্থীকে শিক্ষা দিতেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তন এনেছিলেন মূলত শ্রীচৈতন্যদেব।

চতুর্দশ অধ্যায়
মধ্যযুগের অবসান

নবজাগরণ : খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক মানব জাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। মধ্যযুগের অবসান হয়ে নবযুগ বা বর্তমান যুগের সূত্রপাত হয় এই শতাব্দীতেই।

মধ্যযুগের মানুষ ছিল অনেকাংশে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির অভাব ছিল। একদিকে সামন্তদের নিষ্পেষণ আর একদিকে চার্চের অপরিসীম প্রভুত্ব এই দুয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল। শিক্ষা ছিল ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিল ভূমিদাস। সামন্ত-সমাজ ও চার্চ দেশের ধন সম্পত্তির অধিকাংশের মালিক হয়ে উঠেছিল। চার্চের আদেশই ছিল চরম। যা চলে আসছে, তাই চলবে—এই বিশ্বাস মানুষের বুকে পাথরের মত চেপে বসেছিল। এই অবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের যে চেতনার উন্মেষ হল তাকেই বলা হয় রেনেশাঁস বা নবজাগরণ।

রেনেশাঁস কথাটির অর্থ পুনরুজ্জীবন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মানুষ বহুকালের অজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। গ্রীস ও রোমের শিল্প-কলার কথা এতদিন মানুষ ভুলে ছিল। এখন মানুষ আবার নতুন করে তা জানল। প্রাচীন কালের দর্শন, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানবার জন্য মানুষের ভীষণ কৌতূহল হল। পৃথিবীকে জানতে এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করতে মানুষ ব্যস্ত হয়ে উঠল। জ্ঞান ও সৌন্দর্যের পুজো আবার নতুন করে শুরু হল। নবজাগরণের ফলে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখল।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে। কনস্টান্টিনোপল ছিল পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। সেখানে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল বেশী। বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণী সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর তাঁরা পালিয়ে এসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনা বেড়ে যায় এবং নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। সেই জন্য ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দকে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে ধরা হয়।

নবজাগরণের সূচনা হয় ইটালিতে। ইটালি ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতার কেন্দ্র। ফ্লোরেন্স, মিলান, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি দেশ ক্রুসেডের পর থেকে প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে ইটালীতে এক নতুন ধনিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান হয়। ধনিদের উৎসাহে এখানে প্রতিভাশালী সাহিত্যিক, চিত্রকর ও শিল্পীদের সমাবেশ ঘটেছিল। পরে এর স্রোত ইটালি থেকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই সময় আবির্ভাব ঘটেছিল ইটালি ভাষার অমর কবি পেত্রার্ক ও কাহিনীকার বোকাচোর। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এই যুগকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও প্রথম পৃথিবীর মানুষকে জানালেন যে পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই

সময় অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। এই নবযুগের পুরোভাগে ছিলেন ইংলণ্ডের মহাকবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়র। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারও নবজাগরণের উল্লেখযোগ্য অবদান।

জাতীয় রাষ্ট্রঃ মধ্যযুগের শেষে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সামন্ত যুগের অবক্ষয় সামন্তদের শক্তির হ্রাস ঘটায় এবং তার ফলে শক্তিশালী শাসকরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হন। শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক স্বচ্ছলতাও জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি কারণ। শহরের বণিকরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই শক্তিশালী শাসকের আকাঙ্ক্ষা করে এবং এর ফলে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যও জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করে। একই ভাষাভাষী একদল মানুষ নিজেদের এক জাতীয় বলে ভাবতে শুরু করে।

প্রথম শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে। চতুর্দশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। স্বধীনতার জন্য ডাচদের সংগ্রাম ও পোর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভৌগোলিক আবিষ্কারঃ নবজাগরণের যুগের আর এক কীর্তি হল ভৌগলিক আবিষ্কার। প্রাচীনকাল থেকে ভারত মহাসাগরে আরবীয় বণিকরা বাণিজ্য করত। তারা ভারতের পণ্য দ্রব্য ইটালীর বন্দরে পাঠাত আর ইটালির বণিকরা ঐ সব পণ্য দ্রব্য ইউরোপে চালান দিত। কিন্তু তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার পর এই পথে ব্যবসা-বণিজ্য চালান কঠিন হয়ে পড়ে। সেইজন্য ইউরোপীয় বণিকরা জলপথে ভারত ও চীনে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগল। দিগনির্ণয় যন্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার এবং মানচিত্র তৈরী ইউরোপীয় নাবিকদের এই প্রচেষ্টায় বিশেষ সাহায্য করল। এই চেষ্টায় প্রথম সফল হয় পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রা। এই জলপথে পথ খুঁজতে খুঁজতেই প্রথমে বার্থলোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণ

প্রান্ত পর্যন্ত যান। এর কয়েক বছর পর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা এই পথ দিয়েই ভারতে পৌঁছান। স্পেনীয় নাবিক কলম্বাস ভারতের
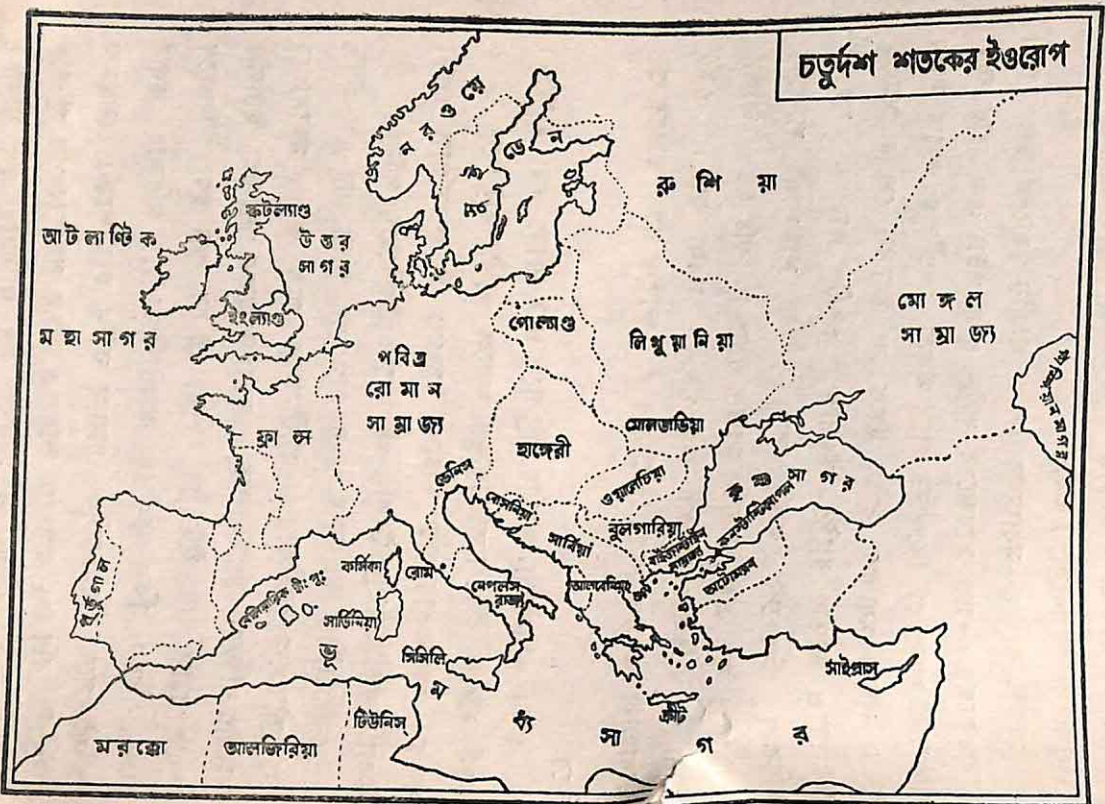
পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে এক দ্বীপ-পুঞ্জে এসে উঠলেন। তিনি ভারতে এসেছেন মনে করে ঐ দ্বীপগুলির নাম দেন 'পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ'। পরে আমেরিগো ভেসপুচি নামে

ফ্লোরেন্সবাসী এক নাবিক আটলান্টিক পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে উপস্থিত হন। তাঁর নাম থেকেই এই নতুন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

পর্তুগাল ও স্পেনের পর পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশও জলপথে বাণিজ্য আরম্ভ করল। প্রাচ্যে ব্যবসা করার জন্য ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হল। ফরাসীরা উত্তর আমেরিকায় ও ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করল।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও সমুদ্রযাত্রার ফলে জলপথে বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ব্যবসায়ের ফলে উপনিবেশগুলিতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার ঘটে। ইউরোপের শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ক্রমে ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

ইংলণ্ডে বিদ্রোহ ঃ এরপর মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে অন্তর্হিত হতে থাকে। তার স্থান দখল করে নতুন যুগ। জাতীয় রাষ্ট্র-গুলিতে রাজারা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন। রাজারা নিজেদের স্বর্গীয় ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। আস্তে আস্তে রাজাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। রাজা এবং জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ ইংলণ্ডেই প্রথম দেখা দেয়।

সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে বিদ্রোহ শুরু হয়। রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডের পর প্রজাতন্ত্রী সরকার স্থাপনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। পরে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়, কিন্তু পার্লামেন্টই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	ইউরোপ	এশিয়া	ভারতবর্ষ	চীন
৪০০	বর্বরদের রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ এলারিক, এটিলা		গুপ্তসাম্রাজ্য—শ্বেতহূণদের আক্রমণ, স্কন্দগুপ্ত, তোরমান, মিহিরকুল	
৬০০	জাস্টিনিয়ান	হজরত মহম্মদ	হর্ষবর্ধন, হিউয়েন সাঙ, আরবদের ভারত আক্রমণ (৭১১ খ্রীষ্টাব্দ)	তাই সুঙ
৮০০	শার্লামান (৭৬৮-৮১৪খ্রীঃ)	হারুণ-অল-রশিদ		তাঙ রাজত্ব (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ)
১০০০	ক্রুসেড (১০৯৫-১২৯১ খ্রীঃ) প্রথম রিচার্ড	সেলজুক তুর্কীদের উত্থান—সালাদিন, চেঙ্গিজ খান	সুলতান মামুদ, মোহম্মদ ঘুরী, কুতুবউদ্দিনের দিল্লী অধিকার (১১৯২-৯৩খ্রীঃ)	কুবলাই খান মার্কো পোলো
১৪০০	তুর্কীদের কনস্টান্টিনোপল অধিকার (১৪৫৩ খ্রীঃ)	অটোম্যান তুর্কীদের উত্থান	সুলতানী রাজত্ব বাবর	

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। ভারত ও ইউরোপের মধ্যযুগ সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে কেন্দ্রীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি কেন ?

২। আরব দেশে মধ্যযুগ কখন এবং কিভাবে শুরু হয়েছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

শূন্যস্থান পূরণ কর—(ক) মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজে—— ও —— প্রাধান্য দেখা দেয়। (খ) গজনীর সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের সময় বিখ্যাত পণ্ডিত — ভারতে এসেছিলেন। (গ) হিংস্র বারবেরিয়ান বা জার্মান দলের আক্রমণে —— সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগের সময়সীমা কতখানি ?

২। কনস্টান্টিনোপলের পতন কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। হূণ জাতির আক্রমণ সম্বন্ধে কি জান ?

২। এলারিক কে ছিলেন ? এলারিক সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি কি কি ?

২। এটিলা সম্বন্ধে কি জান ?

৩। গ্যাসেরিক কে ছিলেন ?

৪। বর্বর আক্রমণের ফল কি হয়েছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন : কোন্‌টা ঠিক বল—

(ক) হূণদের আদি নিবাস ছিল (ইউরোপে/মধ্য-এশিয়ায়/অষ্ট্রেলিয়ায়)।

(খ) রোম সাম্রাজ্য দুভাগে ভাগ হয়ে যায় (৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে/৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

(গ) এটিলা ছিলেন খুব (দয়ালু/অত্যাচারী/উদার)।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। জার্মান উপজাতিগুলির মধ্যে প্রধান কারা ?

২। কত বছর বয়সে হূণ শিশুকে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেওয়া হত ?

৩। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ছিল ?

৪। 'ঈশ্বরের অভিশাপ' নামে কে কুখ্যাত ছিল ?

৫। ওয়েডনেস-ডে নাম কিভাবে হয়েছে ?

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। অন্ধকার যুগ কাকে বলে ? সত্যই কি একে অন্ধকার যুগ বলা যায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। অন্ধকার যুগে কারা, কিভাবে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন ?

২। অন্ধকার যুগে গীর্জার কি ভূমিকা ছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

শূন্যস্থান পূরণ কর : (ক) মধ্যযুগের প্রথম দিকে—ছিল সভ্যতাকে ধরে রাখার একমাত্র মাধ্যম।

(খ) —ভূমিকা মধ্যযুগে ছিল উল্লেখযোগ্য। (গ) মঠে মঠে ছিল বড়— —আর——।

মৌখিক প্রশ্ন : ১। কোন্ সময় থেকে অন্ধকার যুগ শুরু হয় ?

২। বিভিন্ন জাতীয় ভাষার প্রাথমিক সূত্রপাত কখন হয়েছে ?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজ্যজয় ও সংস্কার আলোচনা কর।

২। বাইজান্টাইন সভ্যতার বর্ণনা দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কি জান ?

২। জাস্টিনিয়ানের আইন বর্ণনা কর।

৩। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি কি ?

৪। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের ধর্মজীবন সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন : সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও—

(ক) রথ চালনার প্রতিযোগিতা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। (খ) সেন্ট সোফিয়া গীর্জা তৈরী করতে সময় লেগেছিল পনের বছর। (গ) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা পোপকে মানত না বলে তারা 'ল্যাটিন খ্রীষ্টান' নামে পরিচিত। (ঘ) বাইজান্টাইনের অধিবাসীদের প্রধান শিল্প ছিল কাঠের ওপর নানা রকম নক্সা করা।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। উপ্রাভিডা ইতিহাসে কি নামে পরিচিত ?

২। জাস্টিনিয়ানের মহিষীর নাম কি ছিল ?

৩। বেলিসারিয়াস কে ছিলেন ?

৪। কত খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হল ?

৫। পশ্চিম ইউরোপের প্রধান ধর্মগুরু কে ছিলেন ?

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে কি জান ?

২। আরব সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আগে আরবদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ?

২। ইসলাম ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে কি জান ?

৩। ধর্ম সম্বন্ধে মহম্মদের নির্দেশ কি ছিল ?

৪। কারবালার যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

বিষয়মুখ প্রশ্ন : ঠিকমত সাজিয়ে লেখ—

(ক) বাগদাদ শব্দটির অর্থ	(ক) হারুণ-অল-রসীদ।
(খ) আব্বাসীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা	(খ) ১০ই মহরম।
(গ) হুসেনের মৃত্যুর দিন	(গ) ঈশ্বরের দান।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। আরবদের প্রধান বাজারের নাম কি ছিল ?

২। হজরত মহম্মদের জন্ম কোথায় হয়েছিল।

৩। মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

৪। মুসলমানদের মতে পৃথিবীর সর্বশেষ রসুল কে?

৫। বাগদাদ শহরটি কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল ?

৬। আবুসিনা কে ছিলেন ?

৭। আরবরা কাগজ তৈরীর কৌশল কোথায় শিখেছিল ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। শার্লামানের আকৃতি, প্রকৃতি ও রাজ্যজয় বর্ণনা কর।

২। শার্লামানের শিক্ষানুরাগ সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য কিভাবে গঠিত হল ?

২। 'সঙ অব দি রোলাণ্ড' কি ?

৩। শার্লামানের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখ প্রশ্ন : ঠিকমত সাজিয়ে লেখ—

(ক) শার্লামানের বন্ধু ছিলেন	(ক) পাপিন।
(খ) শার্লামানের পিতার নাম	(খ) পোপ লিও।
(গ) শার্লামানের আমন্ত্রণে তাঁর রাজদরবারে আসেন	(গ) এগিনহার্ড।
(ঘ) শার্লামানের মাথায় প্রাচীন রোম সম্রাটের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেন	(ঘ) ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত আলুকুইন।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। শার্লামান সাধারণত কি পোশাক পরতেন ?
২। ডেসিডেরিয়াস কোথাকার রাজা ছিলেন ?
৩। শার্লামান কিভাবে রাজপ্রাসাদে বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগের যাজক ও পুরোহিতদের জীবন সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগের মঙ্ক ও নানদের সম্বন্ধে কি জান ?
২। মধ্যযুগের মঠ-জীবনের বর্ণনা দাও।
৩। বিশপ নিয়োগ সংক্রান্ত বিবাদ সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখ প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) প্রতিটি প্রদেশের প্রধান যাজককে বলা হত —। (খ) প্রদেশগুলি বিভক্ত ছিল কতগুলি —। (গ) প্যারিসের প্রধান যাজকের নাম —। (ঘ) পুরুষদের মঠকে — বলা হত।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। মেয়েদের মঠকে কি বলা হত ?
২। মঠবাসীরা অবসর সময় কি ভাবে কাটাত ?
৩। বেনিডিক্টন সম্প্রদায় কি ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।
২। মধ্যযুগের ছাত্রজীবন বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে গড়ে উঠেছিল ?
২। মধ্যযুগে দেশীয় সাহিত্য কি ভাবে গড়ে উঠেছিল ?
৩। মধ্যযুগের সংস্কৃতির বর্ণনা দাও।

বিষয়মুখ প্রশ্ন : ঠিকমত সাজিয়ে লেখ—

(ক) 'স্কুলমেন'-দের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন	(ক) দান্তে।
(খ) যাজকরা 'শয়তানের বন্ধু' আখ্যা দিয়েছিলেন	(খ) চসার।
(গ) মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন	(গ) ফরাসী পণ্ডিত এবেলার্ড।
(ঘ) মধ্যযুগে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন	(ঘ) রোজার নামে এক বৈজ্ঞানিককে।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে বইয়ের সংখ্যা খুব কম ছিল কেন ?
২। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় স্থাপিত হয়েছিল ?
৩। 'স্কুলমেন' কাদের বলা হত ?
৪ মিনিসিঙ্গার' কাদের বলা হত ?

সপ্তম অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব কিভাবে হল ? সামন্তদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।
২। সামন্তযুগে ভূমিদাস শ্রেণীর জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে নাইট হতে হলে কি কি অনুষ্ঠান পালন করতে হত ? নাইটদের কর্তব্য কি ছিল ?
২। সামন্তদের সামরিক সংগঠন বর্ণনা কর।
৩। মধ্যযুগের ম্যানর হাউসের বর্ণনা দাও।
৪। ভূমিদাসদের বাসস্থানের বর্ণনা দাও। ভূমিদাসদের খাদ্য কি ছিল ?

বিষয়মুখ প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল — —। (খ) যুদ্ধবিগ্রহ না থাকলে নাইটরা শিকার এবং — — করে সময় কাটাতেন।
(গ) সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত গ্রামগুলিকে বলা হত — —।
(ঘ) সামন্ত সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল — —।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। টুর্নামেন্ট কি ?
২। সামন্তদের খাবার কি ছিল ?
৩। মধ্যযুগীয় সমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিল কারা ?
৪। ছুটির দিনে ভূমিদাসরা কি করত ?
৫। ভূমিদাসরা নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল কেন ?

অষ্টম অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। ক্রুসেডের কারণগুলি বর্ণনা কর।

২। ক্রুসেডের ফল কি হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। সালাদিন, রিচার্ড ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের বিবরণ দাও।

২। পিটার কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখ প্রশ্ন : ঠিকমত সাজিয়ে লেখ—

(ক) রিচার্ড ছিলেন	(ক) ফ্রান্সের রাজা।
(খ) ফিলিপ অগস্টাস ছিলেন	(খ) বার্বারোসা।
(গ) জার্মানির সম্রাট ছিলেন	(গ) ইংলণ্ডের রাজা।
(ঘ) সালাদিন ছিলেন	(ঘ) একজন বীর যোদ্ধা।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। নাইট টেম্পলারস কাদের বলা হত ?

২। ক্রুসেডে যোগদানের সময় রিচার্ডের বয়স কত হয়েছিল ?

৩। ক্রুসেডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল কি ?

নবম অধ্যায়

১। মধ্যযুগীয় শহর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে শহরের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল ?

২। মধ্যযুগে শহরের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর।

বিষয়মুখ প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মধ্যযুগে বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহর প্রায়ই — বা — তীরে গড়ে উঠত। (খ) সমস্ত লণ্ডন শহরটির আয়তন — বর্গ মাইলেরও কম ছিল। (গ) শিল্পের জন্য সৃষ্ট পৃথক সমিতিকে বলা হত —।

২। কোনটি ঠিক বল : (ক) শহরবাসী বণিকরা ক্রমেই হয়ে ওঠে (অর্থশালী/গরীব)। (খ) বাইরে থেকে শহরগুলিকে মনে হত (কুৎসিৎ/জমকালো/সুন্দর)। (গ) প্রত্যেক শিল্পীকে একজন প্রভু-শিল্পীর অধীনে কাজ করতে হত (সাত বছর/চার বছর/পাঁচ বছর)।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে শহরের পথগুলি কেমন ছিল ?

২। প্রত্যেক শহরে হাট বাজার কদিন বসত ?

দশম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। চীনে তাঙ যুগের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।
২। হিউয়েন সাঙ সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা কর।
৪। কুবলাই খান কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। সম্রাট তাঙ-তাই-সুং এর রাজত্বকাল বর্ণনা কর।
২। চীনের সুঙ বংশের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩। ইউয়ান বংশের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বিষয়মুখ প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মোঙ্গলরা চীনদের কাছ থেকে—ও—ব্যবহার শিখে নিয়েছিল। (খ) ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে—পর মঙ্গু খান মোঙ্গলদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। (গ) —— ভ্রমণকাহিনী পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। চেঙ্গিজ কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?
২। চেঙ্গিজের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কে হয়েছিল?
৩। মার্কো পোলো কোন্ দেশের পরিব্রাজক ছিলেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে জাপানের ধর্ম ও সংস্কৃতি বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগে জাপানের বিভিন্ন রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও।

বিষয়মুখ প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

(ক) 'কাবুকি' নামে এক বিশেষ ধরনের থিয়েটার মধ্যযুগে জাপানে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। (খ) ইয়েষাশু শোজা বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌখিক প্রশ্ন : ১। হারিকিরি কি? ২। জাপানের রাজাকে কি বলা হত? ৩। জাপানের বর্ণমালা কোন্ দেশের অনুকরণে তৈরী হয়েছিল?

একাদশ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।
২। হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি বিবরণ লিখে গেছেন?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মিহিরকুল সম্বন্ধে কি জান ?

২। হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখ প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) মহাপণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান——। (খ) বাণভট্ট—নামে একটি বই লিখেছিলেন। (গ) হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল——। (ঘ) একটি শিলালিপিতে হর্ষবর্ধনকে—বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। কনৌজের ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের কি নামে পরিচয় আছে ?

২। হর্ষবর্ধনের রচিত একটি নাটকের নাম বল।

৩। হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণের সময় চীনের সম্রাট কে ছিলেন ?

৪। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে রাজস্বের পরিমাণ কত ছিল ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন : ১। 'ত্রিশক্তি সংগ্রাম' সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। বিষয়মুখ প্রশ্ন : সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :—

(ক) হর্ষবর্ধনের পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পুষ্যভূতি বংশের গৌরবময় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। (খ) কনৌজ অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে পাল, সেন ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল।

মৌখিক প্রশ্ন :

১। ধর্মপাল কোন্ প্রতিহার রাজের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ?

২। দেবপালের কাছে কোন্ রাষ্ট্রকূট রাজা পরাজিত হয়েছিলেন ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। পাল রাজাদের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

২। পাল ও সেন আমলে বাংলাদেশের সাহিত্য, খাদ্য ও বেশভূষা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। শশাঙ্কের চরিত্র আলোচনা কর।

২। বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন সম্বন্ধে কি জান ?

৩। পাল ও সেন যুগের আমোদ-প্রমোদ, ধর্ম ইত্যাদি আলোচনা কর।

৪। ওদন্তপুর ও বিক্রমশীলা বিহারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বিষয়মুখ প্রশ্ন : ঠিকমত সাজিয়ে লেখ :—

(ক) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য হন	(ক) দানসাগর।
(খ) বল্লাল সেন সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন	(খ) বিক্রমশীলা বিহারে।
(গ) পাল বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।	(গ) শশাঙ্ক।
(ঘ) বাংলার কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন।	(ঘ) গোপাল

মৌখিক প্রশ্ন :

১। শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ?
২। সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত ছিল ?
৩। কৈবর্ত বিদ্রোহ কার কার নেতৃত্বে দেখা দেয় ?
৪। পাল রাজারা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। চোল রাজাদের নৌবাহিনী সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখ প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) তাঞ্জোরের মন্দিরে ব্রোঞ্জের — মূর্তি ধাতু শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
(খ) মহেন্দ্রবর্মার রচিত — গ্রন্থটি একটি উপাদেয় রচনা।
(গ) চোল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন — ও —।

মৌখিক প্রশ্ন : ১। বাদামীর চালুক্য বংশ কোথায় রাজত্ব করেছিল ?
২। আইহোলের দুর্গা মন্দির কাদের সময় নির্মিত হয়েছিল ?
৩। পল্লব বংশ কি জন্য বিখ্যাত ?

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। মধ্য-এশিয়া, চীন ও তিব্বতে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন : ১। সুবর্ণভূমি অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। পশ্চিমে ভারতীয় সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বিষয়মুখ প্রশ্ন : সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :—

(ক) অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে দেহত্যাগ করেন। (খ) আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অনেক আগে থেকেই গ্রীক দর্শনের ওপর ভারতীয় দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। (গ) তিব্বতের রাজা স্রংসান গাম্পো ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক।

মৌখিক প্রশ্ন : ১। মধ্য এশিয়ায় অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ ও মঠ কে আবিষ্কার করেন ? ২। চীনা ভাষায় বুদ্ধকে কি বলা হয় ? ৩। বরবুদুরের বৌদ্ধমন্দির কোথায় অবস্থিত ? ৪। আঙ্কোরভাট মন্দিরটি কোথায় ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন : ১। দিল্লীর দাসবংশের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

২। আলাউদ্দিন খলজির রাজ্যজয় ও শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর।

৩। মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র আলোচনা কর।

৪। তুর্কী-আফগান যুগের সমাজ ও ধর্মের পরিচয় দাও।

৫। সুলতানী আমলে বাংলার অবস্থা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। সেলজুক তুর্কী কারা ? এদের প্রধান কৃতিত্ব কি ?

২। মহম্মদ ঘুরী সম্বন্ধে কি জান ?

৩। কবির, নানক ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

বিষয়মুখ প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—। (খ) ফিরুজ তুঘলকের— ধর্মে গভীর বিশ্বাস ছিল। (গ) দিল্লীর সুলতানী শাসকের মধ্যে — মত পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। (ঘ) বলবনের সভাকবি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কবি —।

মৌখিক প্রশ্ন : ১। ভারতের মুসলমান আক্রমণ প্রথমে কে শুরু করেন ?

২। সুলতান মামুদের রাজধানী কোথায় ছিল ?

৩। কুতুবমিনারের নির্মাণ কার্য কার সময়ে শুরু হয়।

৪। লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

৫। ভারতে তামার নোট কে চালু করেছিলেন ?

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন : ১। ইউরোপে নবজাগরণ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধধর্মী প্রশ্ন :

১। নবজাগরণ কোথায় এবং কেন শুরু হয়েছিল ?

২। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণগুলি কি কি ?

৩। জাতীয় রাষ্ট্র কিভাবে এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রথম গড়ে ওঠে ?

বিষয়মুখ প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) —খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে।

(খ) নবযুগের পুরোভাগে ছিলেন ইংলণ্ডের মহাকবি ও নাট্যকার —।

(গ) —নাম থেকেই এই নতুন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

মৌখিক প্রশ্ন : ১। রেনেশাঁস কথাটির অর্থ কি ?

২। প্রাচ্য ইউরোপের বণিকদের আকৃষ্ট করেছিল কেন ?

৩। ভাস্কো-ডা-গামা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পৌঁছান ?